লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...

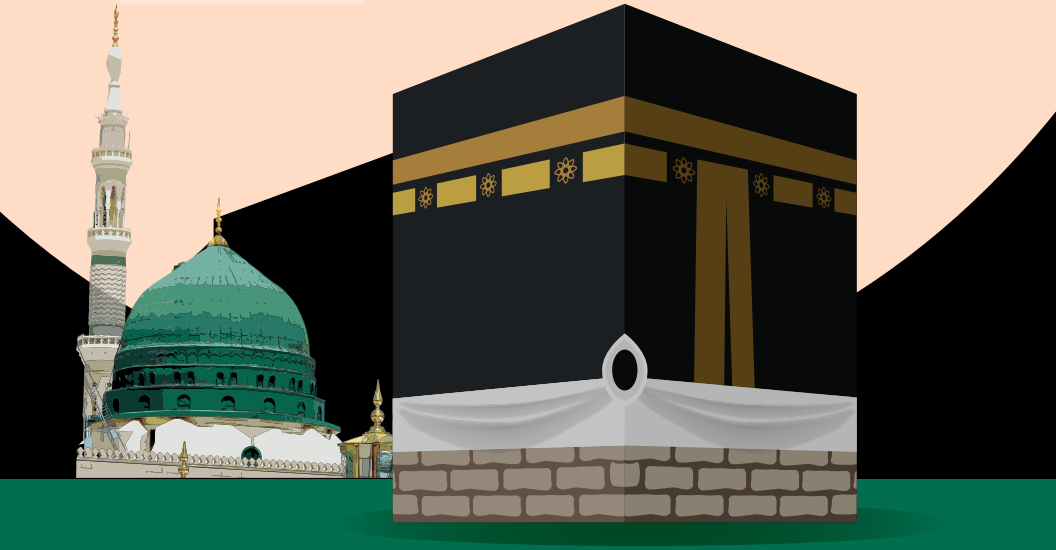

হজ্জ ও উমরা

মাসায়েল, ফাজায়েল ও নির্দেশনামূলক গাইড

(মুফতী) শামছুল ইসলাম জিলানী

হজ্জ ও উমরা

মাসায়েল, ফাজায়েল ও নির্দেশনামূলক গাইড

হজ্জ ও উমরা

মাসায়েল, ফাজায়েল ও নির্দেশনামূলক গাইড

(মুফতী) শামছুল ইসলাম জিলানী

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম

মাদরাসায়ে আশরাফিয়া দারুল উলুম,
বলরামপুর, কোটবাড়ী রোড, কুমিল্লা

খতিব

মসজিদে কুবা, নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা

প্রকাশনায়

মাদরাসায়ে আশরাফিয়া দারুল উলূম
বলরামপুর, কোটবাড়ী রোড, কুমিল্লা

০১৭১১৩২৭ ০৪৭

হজ্জ ও উমরা

(মুফতী) শামছুল ইসলাম জিলানী

প্রকাশকাল

যুলক্বা'দাহ ১৪৪৩/জুন ২০২২ (৭ম সংস্করণ)

স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

মাদরাসায়ে আশরাফিয়া দারুল উলূম

ডিজাইন

আবু লাবিব ■ 01830-004233

প্রাপ্তিস্থান

মাদরাসায়ে আশরাফিয়া দারুল উলূম, কুমিল্লা

মসজিদে কুবা
নজরুল এভিনিউ, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা

ডা. মুহা. হারুনুর রশীদ ভূইয়া
পৌরম্যানশন, ২য় তলা
লাকসাম রোড, কুমিল্লা (চেম্বার)

০১৭১১ ৩২ ৭০ ৪৭, ০১৭১১ ৩২ ৩২ ১০, ০১৭১২ ২০ ২৫ ১০, ০১৮১১ ৩৪৪ ২০০

বিনিময় | নেক দু'আ

(বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)

আল-ইহদা

পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম আব্বাজান
আলহাজ্ব (ইঞ্জিনিয়ার)মুঈনুল ইসলাম ভূইয়া,
যার সাথে হজ্জ ও উমরা সফরের স্মৃতিগুলো
আজও বারবার মনে পড়ে।
তার মাগফিরাত ও জান্নাতে উঁচু মাকাম কামনায়।

এবং পরমা শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান,
তাঁর হায়াতে ত্বাইয়েবা কামনায়...।

যাঁদের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও লালন পালনের কারণে
এবং একজন হাফেয-আলেমের
সম্মানিত ও গর্বিত পিতা-মাতা হওয়ার
প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের দু'ফোটা অশ্রুর বিনিময়ে এ প্রয়াস।

আমার শায়েখ ও মুরশিদ, যাঁর সোহবত ও তরবিয়তে
এ অধমের অনেক অনেক প্রাপ্তি,
উলামা মাশায়েখ ও এদেশের সর্বস্তরের মুসলমানের
আধ্যাত্মিক রাহবার, যাঁর রূহানী ফুয়ূযাত
ও দু'আর বরকতে এ প্রয়াস,
আল্লামা শাহ আহমদ শফি রহ.

শামছুল ইসলাম জিলানী

হজ্জের সফরে
অতিগুরত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- পবিত্র এই সফরে গুণাহ মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফে অবস্থানকালীন আদবের প্রতি খুব খেয়াল করে চলা। অন্যথায় সওয়াব অর্জনের বদলে গুণাহ-ই বেশি হবে।
- মাযহাবের ভিন্নতার কারণে অনেক মাসআলায় আরবদের সাথে আমাদের কিছু ভিন্নতা রয়েছে। যেমন জানাযায় প্রতি তাকবীরে হাত ওঠানো, একদিকে সালাম ফিরানো, নামাযে বুকে হাত বাঁধা, জোরে আমীন বলা, হজ্জের ৫দিন মুসাফির হোক বা মুকীম– মুসাফিরের নামায পড়া, ১০ যুলহজ্ব কংকর, কোরবানী ও হলক্বের মধ্যে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব না হওয়া, হজ্জের পূর্বে উমরা জায়েয না হওয়া, উমরা করতে আয়েশা মসজিদ থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী না হওয়া, ১১ ও ১২, যিলহজ্ব যোহরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করা জায়েযসহ আরও কিছু বিষয়। এই ভিন্নতায় বিচলিত হবার কিছু নেই। তাদের দেখাদেখি অনুরূপ আমল করারও প্রয়োজন নেই। বরং হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে আমল করা খুব জরুরি। কারণ কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হানাফী মাযহাব দলীরে দিক থেকে সবচেয়ে মজবুত। তাই এটা কোনো ভাবেই যেন দেশে ফেরার পর বিভেদে রূপান্তরিত না হয়। কারণ হজ্জ অনেক বড় ঐক্যের প্রতীক।
- ছবি তোলা ও ভিডিও করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা। বিশেষ করে তাওয়াফ, রওযায়ে আতহারের জিয়ারতসহ আমলের ছবি বা ভিডিও একপ্রকার বেয়াদবীর শামিল। ছবিতে স্মরণীয় হওয়ার চেয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প করা উচিত।
- মহিলারা শরয়ী পর্দার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অযথা গল্প-গুজব, গীবত, শেকায়েত, অন্যের সমালোচনা থেকে বিরত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।
- সকলের চোখের গুণাহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকার চেষ্টা করা আবশ্যক। এ সফরে চোখের হেফাযত করা হজ্জ কবুলের প্রধান আলামত।
- হারাম শরীফের জামাতে মহিলা পুরুষ একসাথে, অথবা পুরুষেরা মহিলার পিছনে নামাযে একদম না দাঁড়ানো। চাই স্বামী, ছেলে, পিতা, ভাই, হোক না কেন। অনেক ক্ষেত্রে এ কারণে নামায ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে; বরং মহিলারা নির্ধারিত স্থানে জায়গা না পেলে– পুরুষদের সাথে এভাবে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে একাকী নামায পড়ার সওয়াব অবশ্যই বেশী হবে। (বুখারী, বায়হাকী, ইবনে হিব্বান)
- তওয়াফের স্থানে বা যেখানে অন্যের কষ্ট হয়, এমন স্থানে তওয়াফের বা অন্য কোন নামাযের নিয়ত না করা। হাজরে আসওয়াদ বা কোন বিশেষ স্থানে গায়ের জোরে অন্যকে কোনোভাবেই কষ্ট না দেওয়া। মনে রাখবেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নাত। অন্যকে কষ্ট দেওয়া হারাম।
- নিজের আরামের চেয়ে আল্লাহর প্রতিটি মেহমানের সম্মান ও খেদমতের চেষ্টা বেশি বেশি করা।
- বিদেশ ফেরৎ যাত্রীদের মতো কেনাকাটায় ব্যস্ত না হওয়া।

ভূমিকা

ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের মধ্যে অন্যতম হল হজ্জ্ব পালন করা। হাদিস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তির প্রকাশ্য শরয়ী কোন ওজর, বা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন রোগ তাকে হজ্জ পালন হতে বিরত না রাখে, আর হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে, সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক; এতে আল্লাহর কোন দায়িত্ব নাই"। বুখারী, দারেমী, তিরমিযী ১/১৬৭

উম্মতের দরদী রাহমাতুল্লিল আলামিনের কণ্ঠে কঠিন বদদোয়ার ইংগিত, যা অন্য কোনো ইবাদতে পাওয়া যায় না। আবার অনেকেই হজ্জে না গিয়ে বা সিরিয়াল না আসায় হজ্জের পরিবর্তে উমরা পালন করে যথেষ্ট মনে করেন। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্যান্য ইবাদতের মত পবিত্র হজ্জ যেহেতু জীবনে বার বার আসেনা, যার কারণে হজ্জ বিষয়ক আলোচনা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের সুযোগ হয় না বিধায় সঠিক ভাবে হজ্জ্ব করা অনেকের নসিব হয় না। হজ্জে এমন এমন ভুল মাসআলার উপর আমল হতে দেখা যায়, যেগুলোর ব্যাপারে সাধারণ হাজী সাহেবগণ এমনকি অনেক আলেমগণেরও জানা থাকে না।

তাই যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তার প্রথম কর্তব্য হলো একজন অভিজ্ঞ আলিমের কাছে হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জেনে নেয়া, অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করা। তারপর হজ্জের আহকাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন কিতাব সঙ্গে রাখা, যাতে প্রয়োজনে তা থেকে সাহায্য নেয়া যায়। সবচেয়ে ভালো হয়, বিশ-পঁচিশ জনের একটি কাফেলায় একজন (অভিজ্ঞ হক্কানী) আলিমকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া– যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ে সফর সঙ্গীদের সাহায্য করতে পারেন।

এ দিক বিবেচনা করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হজ্জ ও উমরার জন্য গাইড স্বরূপ একটি কিতাব হাজী সাহেবদের খিদমাতে পেশ করার লক্ষ্যেই এ প্রয়াস। বিভিন্ন ফতওয়ার কিতাব মুতালাআ করে এবং হজ্জের সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংকলন করা হয়েছে। এর সাথে আল্লামা আবু তাহের মিসবাহ সাহেবের আবেগভরা হজ্জের সফরনামা "বায়তুল্লাহর মুসাফির" থেকে বিভিন্ন স্থানে হুবহু নকল করা হয়েছে। যা আল্লাহর ঘরের প্রকৃত আশেকগনের হজ্জের রূহানিয়াত ও হাকীকত অর্জনে বড় সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে এ কিতাবখানা হাজী সাহেবদের খিদমতে পেশ করতে উলামা হাযারাত, বন্ধু-বান্ধবসহ সকলের শুকরিয়া আদায় করছি, তাদের নেক দু'আ, সু-দৃষ্টি ও সর্বাত্মক সহযোগিতা না হলে বইটি প্রকাশনার উপযুক্ত হতো কি না সন্দেহ।

বিশেষভাবে মারকাযুদ্দাওয়াহ ঢাকার মুফতী ইয়াহইয়া সাহেবের লিখিত "হজ্জ ও উমরা" কিতাব থেকে বিভিন্ন জরুরী মাসায়েল ও বর্ণিত দু'আর সংযোজন আশা করি বইটির গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি করে দেয়।

এর সাথে সবচেয়ে বেশী শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি **অত্যন্ত মুহাব্বতের দ্বীনি বড় ভাই ডাঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ ভূঁইয়া সাহেব**-এর যিনি বইটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে হাজী সাহেবদের খেদমাতে পেশ করার শুধু উদ্যোগ-ই নেননি, বরং **এ কয়েকটি সংস্করণ তারই জোড়ালো তাকিদের ফসল**। (নাম প্রকাশে যদিও তাঁর জোড়ালো আপত্তি ছিল) এর সাথে **আরাফাতী ভাই প্রফেসর গোলাম কিবরিয়া খন্দকার তার শশুর-শাশুড়ীর রুহের মাগফিরাতের জন্য** এ সংস্করণে সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এভাবে ইখলাসপূর্ণ দ্বীনের সার্বিক খিদমাত এর জন্য মউত পর্যন্ত কবুল করুন।

মানুষ বলতেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক এবং অপরিপক্ক হাত ভুল করেই থাকে। কোন সুহৃদয় আলেম ভুল ত্রুটি সম্পর্কে আমাদের অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তা'আলা হজ্জ সম্পর্কিত এ বইটি কবুল করুন। এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তর প্রতিদান দান করুন ও আমাদের সকলকে বারবার যিয়ারাতে হারামাইন শরীফাইন ও হজ্জে মাবরুর নসীব করুন এবং সীরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

শামসুল ইসলাম জিলানী

সূচিপত্র

হজ্জ একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত ১৩
তালবিয়া ১৭
তালবিয়া পড়ার সময় কখন শুরু এবং কখন বন্ধ ১৮
হজ্জের অর্থ ১৮
হজ্জ কাদের উপর ফরয ১৯
মহিলাদের হজ্জের সফরে মাহরাম থাকা শর্ত ১৯
মিথ্যা মাহরাম বানানো ১৯
হজ্জের ফযিলত ২০
হজ্জ বিষয়ক কিছু ভুল ধারণা ২১
হজ্জের নিয়ত করার পর করণীয় ২২
কাযা আদায় করার জরুরী মাসআলা ২৩
হজ্জের সফরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ২৪
আসরের পর নফল ও কাযা নামায পড়ার হুকুম ২৫
হজ্জের সফরে চোখের হেফাযত করতে পারা হজ্জ কবুল হওয়ার বড় আলামত ২৬
হজ্জের সফরে আবশ্যকীয় দুটি গুণ ২৭

মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে দৈনন্দিন আমলের রুটিন ২৯

দুরুদ শরীফের আমল ৩২
সালাতুত্ তাসবীহ ৩২
মসজিদে হারামে নামাযে জানাযা ৩৩
সালাতুল জানাযার নিয়ম ৩৩
মাজহাবের ভীন্নতা ৩৪
বালেগ পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে দু'আ ৩৪
ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে দু'আ ৩৪
মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে দু'আ ৩৫
জানাযার পূর্বে দ্রুত সুন্নাত পড়া ৩৫
মহিলাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ ৩৫
আযান ও ইক্বামাতের জওয়াব ৩৫
আযানের জওয়াব ৩৬

আযানের দু'আ ৩৬
ইক্বামতের দু'আ ৩৬
হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা ৩৭
হজ্জের প্রকারভেদ ঃ হজ্জ তিন প্রকার ৩৯
হজ্জের ফরয ৩টি ৩৯
হজ্জের ওয়াজিব মূলত ৬টি ৩৯
এ ছাড়াও কিছু কাজ করা ওয়াজিব ৩৯
মহিলাদের হজ্জের বিশেষ মাসায়েল ৪০
মহিলাদের জন্য নফল তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদের চুমু দেয়া ৪২
মহিলা ও পুরুষ একসাথে নামায পড়ার হুকুম ৪৪
মহিলাদের জন্য পর্দা ৪৮
হজ্জে বদল ৪৮
বদলী হজ্জের নিয়ত ৪৯
হজ্জে বদলে ইহরাম কোথায় থেকে বাঁধবেন ৪৯
বদলী হজ্জের ইহরাম ৪৯
বদলী হজ্জের খরচ সংক্রান্ত মাসআলা ৫০
হজ্জে পালনের নিয়মাবলী ৫০
হজ্জে তামাত্তু' ৫০
উমরা পালনের নিয়মাবলী ৫১
অন্য সময়ে উমরা করা ৫১
হজ্জের মৌসুমে উমরা করার হুকুম ৫১
উমরার ফরয ২টি ৫২
উমরার ওয়াজিব ২টি ৫২
ইহরামের ওয়াজিব ২টি ৫২
ইহরামের উত্তম বিষয়াদি ৫২
ইহরাম কোথায় থেকে বাঁধবেন ৫৩
ইহরাম বাঁধার নিয়ম ৫৪
উমরার ইহরামের নিয়ম ৫৪
সেলাই বিহীন কাপড় পরিধানের নাম ইহরাম নয় ৫৫
ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা ৫৬
হজ্জ ও উমরার নিয়ত নির্দিষ্ট করে করতে হবে ৫৬
ইহরামের নিয়ত করার পর কিভাবে চলবেন ৫৭

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ৫৮

ইহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ নয় ৫৯
ইহরাম অবস্থায় মাকরুহ বিষয়াদি ৬০
শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ইহরাম ৬০

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ৬১

রওয়ানা দিতে ও বিমান বন্দরে করণীয় ৬৩
প্লেনে উঠার পূর্বে ইহরামের নিয়ত না করলে ৬৩
প্লেনে নামায পড়ার হুকুম ৬৩
উমরার তাওয়াফের প্রস্তুতি ৬৬
বাইতুল্লাহ শরীফের ১ম দর্শণ, ১ম দৃষ্টি ৬৯
উমরার ২য় ফরয তাওয়াফ ৭৭
তাওয়াফের জরুরী কিছু মাসায়েল ৭৮
ইসতিলাম ৮০
হাজারে আসওয়াদ ৮১
তাওয়াফের নামায ৮৩
মাকামে ইবরাহীম ৮৫

যমযম ৮৯

যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা ৯০
উমরার ৩য় কাজ সাঈ ৯০
সাঈর নিয়মাবলী ৯১

হলক বা কসর ৯৫

উমরার চতুর্থ কাজ হলক ৯৫
মহিলাদের জন্য চুল কাটা ৯৫
মাথার কিছু অংশ চুল কাটা ৯৫
ইহরামের শেষে সাঈর পর নিজে চুল কাটা ৯৬
কাবা শরীফে ১২০টি রহমত ৯৭
দু'আ কবুলের স্থান সমূহ ৯৭

ধারাবাহিকভাবে হজ্জের ৫দিনের আমল ৯৯

৭ই যুলহজ্জ ৯৯
হজ্জের ইহরাম ফরয ১০০
হজ্জের মধ্যে তালবিয়ার সময় ১০০
৮ তারিখের পূর্বে মিনায় রওয়ান হওয়া ১০১
১০ যিলহজ্জের পূর্বে হজ্জের সাঈ করা ১০১

মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ১০২

মিনা, মুযদালিফা, আরাফায় কসরের নামায পড়বে কিনা ১০৪
মিনার বাইরে তাবু ১০৬

হজ্জের ২য় দিন আরাফা ১০৭
আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ১০৬
৯ যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান ১১২
আরাফার দিনের আমল ১১৪

মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ১১৭

মাগরিব ও এশার নামায একত্রে ১১৭
মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে ১১৮

কংকর নিক্ষেপ ১২১

কংকর কীভাবে নিক্ষেপ করবেন ১২১
১০ যিলহজ্জ হজ্জের ৩য় দিন ১২১
তালবিয়া বন্ধ ১২২

কুরবানী ও হলক ১২৪

হালাল হওয়ার পূর্বে নিজের বা অন্যের চুল কাটা ১২৫
ইহরাম থেকে হালার হওয়া ১২৬
১১ যিলহজ্জ হজ্জের ৪র্থ দিন ১২৮
বিদায়ী তাওয়াফ ১৩০
মক্কা শরীফের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ১৪০

যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ ১৪৬

মদীনা শরীফের হাজিরী ও আদব ১৪৯
মসজিদে নববীতে নামাযের ফযীলত ১৫০
সালাম পেশ করার আদব ১৫০
রিয়াজুল জান্নাত ১৫৪
জান্নাতুল বাকী ১৫৫
দুরুদ শরীফের ফযীলত ১৫৯
মসজিদে নববীতে বিশেষ পিলার ১৬৩
শেষ বিদায় ১৬৫
হজ্জ থেকে ফিরে কিভাবে চলা-ফেরা করা চাই ১৬৬
হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত ১৬৮
দু'আয়ে মাসূরা ১৬৯

হজ্জ
একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত

হজ্জের হাকীকত ও রূহানিয়াত নিয়ে আল্লামা আবু তাদের মিসবাহ সাহেব হাফি. কত সুন্দর লিখেন-

> হজ্জ মানেই তো ইশক ও মুহাব্বাত, প্রেম ও ভালবাসার গোপন অভিসার। এখানে শুধু বান্দা ও তাঁর প্রেমাস্পদ। এখানে শুধু তাঁর ঘরের দুয়ার এবং অন্তরের আবেগের জোয়ার। এখানে যত গোপনীয়তা তত পূর্ণতা।
>
> আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক শুধু আ'বাদিয়াত ও দাসত্বের নয়, বরং প্রেম ও ভালবাসা এবং ইশক ও মুহাব্বতের সম্পর্ক। মানুষ যদি আল্লাহর শুধু দাস হতো তাহলে কি তার জন্য সৃষ্টি জগতের এত বিপুল আয়োজন হতো? তাহলে কি আল্লাহ এত আদর সমাদর করে বলতেন, ডাকো আমাকে, সাড়া দিবো আমি তোমার ডাকে।
>
> মুহাব্বতের দাবী হলো মাহবুবের দীদার ও মিলন। কিন্তু দুনিয়ার যিন্দেগীতে কিভাবে সম্ভব? মানুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তা'আলার অসীম সৌন্দর্য ও তাঁর নূর তাজাল্লী বরদাশত করতে পারবে না! ঐ নূর তাজাল্লির সামান্য উদ্ভাসেই তো তুর পাহাড় সারখার হয়ে যায়, হযরত মূসা কালীমুল্লাহর জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। আল্লাহর দীদার এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার পরমমিলন তো হবে জান্নাতে। কিন্তু দুনিয়াতে বান্দার ইশক ও মুহাব্বত কিভাবে পরিতৃপ্ত হবে? বান্দার হৃদয়ের আকুতি যে, আল্লাহর কাছে যাওয়া, আল্লাহকে কাছে পাওয়া।
>
> বান্দার প্রতি আল্লাহ কত মেহেরবান! বান্দাকে কত ভালবাসেন! বান্দার দিলের ইশক ও মুহাব্বতের জ্বলনকে শান্ত করার জন্য; তার হৃদয়ের আকুতি ও মিনতিকে পরিতৃপ্ত করার জন্য দুনিয়ার একটি ঘরকে তিনি আপন সত্তার সঙ্গে

সম্পর্ক দান করেছেন। কালো গিলাফে ঢাকা আল্লাহর ঘর!

বায়তুল্লাহ! কী আশ্চর্য অনুভূতি। যেন ঐ ঘরের দুয়ারে দাঁড়ালেই আল্লাহকে দেখা যাবে। আল্লাহকে পাওয়া যাবে। ঘরের দীদার যেন স্বয়ং ঘরওয়ালার দীদারের কিছুটা স্বাদ, কিছুট আনন্দ দান করে। জগতের আর কোন স্বাদ, কোন আনন্দের সাথে এর কোন তুলনা হয় না।

আল্লাহর ঘর ও বায়তুল্লাহর এ মহান নেয়ামত আমরা পেয়েছি কার মাধ্যমে, কার ওছীরায়? পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওসীলায়। তাহলে তাঁর প্রতি উম্মতের মুহাব্বাত ও ভালবাসা কত গভীর হবে! তাঁর জন্য উম্মতের দিল কত ব্যাকুল বেক্বারার হবে? তিনি শুয়ে আছেন সোনার মদীনায় রওযা শরীফে সবুজ গম্বুজের নীচে। সুতরাং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের পর যিয়ারতে মদীনার আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়াই তো স্বাভাবিক। আর এটাই হলো যিয়ারতে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারতে মদীনার হাকীকত ও তাৎপর্য।

মানুষের জীবন যেমন বিচিত্র তেমনি বিচিত্র তার জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু মুমিনের জীবনের স্বপ্ন শুধু একটি, দীদারে বাইতুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মদীনাহ। এ স্বপ্নই মুমিনের জীবন, এ স্বপ্নই তার জীবনের অবলম্বন। তবে কাহারো পূর্ণ হয় দীদারে বায়তুল্লাহ এবং যিয়ারাতে মদীনার স্বপ্ন। কখনো জীবনের প্রারম্ভে কখনো সায়াহ্নে, কখনো একবার, কখনো বারবার তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা ..... লাকা লাব্বাইক। আরেকজন সারা জীবন পথের কিনারে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন হাজীদের কাফেলা চলে যাওয়া এবং ফিরে আসা। তবে আমার বিশ্বাস এক মুমিন বান্দার স্বপ্নের সফলতার আনন্দ এবং অন্যজনের স্বপ্নের ব্যর্থতার বেদনা, দু'টোই আল্লাহর প্রিয়। কেউ জানেনা, এ দুই বান্দার মধ্যে কে আল্লাহর বেশী প্রিয়, ইহরামের সাদা লেবাসের মুসাফির, না পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এবং ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকা আল্লাহর এই মজবুর বান্দা! কারণ উভয়ের স্বপ্ন দেখা স্বার্থক। যদি আল্লাহ কবুল করেন।

হজ্জের সফরের প্রতিটি আমলে নিজেকে চৌদ্দশত বৎসর দূর অতীতের মাঝে বিলীন করে দিতে হবে। সব বিষয়ে আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। হযরত ইবনে উমর রা. মক্কা মুকাররমার পথে নিজ বাহনের মাথা ঘুরিয়ে দিতেন, যেন তা আঁকা-বাঁকা হয়ে

পা ফেলে। তিনি বলতেন, হয়ত এর পা ঐখানে পড়বে যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহনের পা পড়েছিলো। উমার আমীরী রহ. বলতেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক যবান যে স্থানকে চুম্বন করেছে, আমিও তা চুম্বন করেছি। শুধু তাঁর চুম্বন স্পর্শে ধন্য হওয়ার আশায়।

"একটি গাছ (উসতুয়ায়ে হান্নানা) নবীর বিরহে কাঁদে, পাথরের পাহাড় আল্লাহর নবীকে ভালবাসে, তোমার অন্তর যদি মদীনার যিয়ারাতে না কাঁদে, নবীকে ভালবাসতে না পারে, তাহলে কি মূল্য এমন মৃত হৃদয়ের! এমন মুরদা দিলের! আর যদি তুমি হও আশিকে রাসূল, তাহলে তোমার চেহারায়, শরীরে, তোমার ঘরে, তোমার পরিবারে এবং তোমার জীবনে নেই কেন সুন্নাতের ছায়া, তোমার জীবনে নেই কেন মিসওয়াকের গুরুত্ব? কাপড় কেন টাখনুর নীচে থাকে, তোমার চোখের সামনে নবীর সুন্নাত মিটে যায়, অথচ তুমি চুপ, তোমার দিলে লাগে না চোট।

এক কথায় হজ্জের সফরে নিজের অনুভূতিকে জাগ্রত করতে হবে। ইহরাম বেঁধে লাব্বাইক উচ্চারণের সাথে সাথে গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে, আমি গান্দেগীর নীচতা থেকে বান্দেগীর উচ্চতায় উপনীত হলাম, আমার মনিব যেন বান্দাকে বান্দার আসল লেবাস পরিয়ে দিলেন। জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে মানুষের পরিচয় পোষাক থাকে। ইহরাম হলো বান্দার সারা যিন্দেগীর বন্দেগীর পরিচয় পোষাক। মানুষের যখন কোন পরিচয় থাকেনা তখনই সে লাভ করে আল্লাহর পরিচয়। ইহরামের লিবাস ধারন করে মানুষ আসলে তার ক্ষনস্থায়ী সমস্ত পরিচয় বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর পরিচয়গ্রহণ করে। আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিচয়।

হজ্জ ও উমরা শেষে যখন ইহরামের লিবাস খুলে ফেলবে, তখন যদি এই লিবাসের শুভ্রতাটুকু ধরে রাখতে পারো জীবনের সকল ক্ষেত্রে, তাহলেই কামিয়াব ও খোশনসীব। ইহরাম যদি হয় সাধারণ কোন পোশাক পরিবর্তনের মত, তাহলে সত্যি সত্যি আল্লাহর প্রয়োজন নেই এই প্রাণহীন ইহরাম ধারণে।"
(বায়তুল্লাহর মুসাফির)

শাইখুল মাশায়েখ হযরত শিব্‌লী রহ. এর জনৈক মুরীদ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর শায়খ শিবলী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- হজ্জের নিয়ত করার সময় তুমি কি জন্ম হতে আজ পর্যন্ত হজ্জের খেলাফ

যাবতীয় কার্যকলাপ ত্যাগ করার সংকল্প করেছ?

তুমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অনুভব করেছ? তুমি কি তওয়াফের মধ্যে রমল করার সময় দুনিয়া হতে পলায়ন করার অবস্থা অনুভব করেছ? তুমি কি হাজারে আছওয়াদে হাত রেখে চুম্বন করেছিলে? উত্তরে মুরীদ বললেন, হ্যাঁ। তিনি ভয়ে জড়সড় হয়ে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি কি জান, যে ব্যক্তি হাজারে আছওয়াদে হাত রাখল সে যেন আল্লাহ তা'আলার সহিত মোছাফাহা করল। আর যে আল্লাহর সহিত মোছাফাহা করল সে যাবতীয় ভয়ভীতি হতে মুক্তি পেয়ে গেল। আচ্ছা ! মুক্তির কোন চিহ্ন কি তোমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে?

সাফা পাহাড় হতে নীচে অবতরণ করার সময় আত্মার যাবতীয় রোগ দূর হয়ে তোমার মধ্যে কি পবিত্রতা এসেছিল?

তুমি কি আরাফাতের ময়দানে হাজির হয়ে বুঝতে পেরেছ কি যে, দুনিয়াতে কেন এসেছ, কি করতেছ এবং কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি গিয়ে আল্লাহর জিকির এমনভাবে করেছিলে যে, মন হতে তখন আল্লাহ ব্যতিত অন্য সব কিছুর ধ্যান ধারণা মুছে গিয়েছে? জিজ্ঞাসা করলেন, মিনায় গিয়ে কি কোরবানী করার সময় আপন নফস ও কুপ্রবৃত্তিকে কোরবানী করেছিলে? বললেন, আচ্ছা তওয়াফে যিয়ারত করার সময় আল্লাহর তরফ হইতে তোমার কোন ইজ্জত সম্মান করা হয়েছিল কি? কেননা হাদীস শীফে বর্ণিত আছে, হজ্জ এবং উমরা করলে যেন আল্লাহর সহিত যিয়ারত হয়। আর যে আল্লাহর সহিত যিয়ারত করে তাহার সম্মান ও ইকরাম করা হয়। তিনি আরো জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এহ্রাম খুলিয়া হালাল হওয়ার সময় কি আজীবন হালাল উপার্জন করবার সংকল্প করেছিলে? বিদায়ী তাওয়াফ করার সময় কি নিজের শরীর এবং মন সব কিছুকে দুনিয়া আসক্তি থেকে পুরোপুরি বিদায় দিয়েছিলে? এভাবে শাইখ অনেক প্রশ্ন করলেন, আর মুরীদ না বলে উত্তর দিতে লাগলেন যে, এমন কিছুইতো হয় নাই।

তারপর হযরত শায়েখ শিবলী রহ. মুরীদকে বললেন: যাও বাবা, যেইভাবে বিস্তারিত তোমার নিকট বর্ণনা করলাম ঠিক সেইভাবেই পুনঃ হজ্জ করিয়া আস।

এই ঘটনা এই জন্য বর্ণনা করা হল, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর ওলীগণ কিভাবে হজ্জ করতেন। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা আমাদের সকলকে এভাবে হজ্জ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(ফাযায়েলে হজ্জ)

তালবিয়াহ

لَبَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ
لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَشَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণ

লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল্ হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ

আমি হাযির! তোমার দুয়ারে হে আল্লাহ! আমি হাযির! তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই এবং সকল রাজত্বও তোমার, তোমার কোন শরীক নেই।

তালবিয়ার ফযিলত

"যখন কোন ব্যক্তি (হজ্জ বা উমরার জন্য) তালবিয়া পাঠ করে, তার ডানে বামে আল্লাহ তা'আলার যত সৃষ্টি জীব রয়েছে সকলে তার সাথে লাব্বাইক বলতে থাকে। এমনকি সমস্ত যমীনে ইহা বিস্তৃত হয়ে যায়"। **(তিরমিযী)**

দুআ' আরবীতে করবে না নিজের ভাষায়

তালবিয়া ভালভাবে মাশক করে সহিহ শুদ্ধভাবে শিখে নেয়া জরুরী। কারণ, ইহরামের জন্য তালবিয়া মুখে পড়া জরুরী। তবে তালবিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দুআ'গুলো উলামাদের থেকে সহীহ শুদ্ধ উচ্চারণ ভালভাবে শিখে নিবেন। কারণ উচ্চারণ ভুলের কারণে অনেক সময় অর্থে পরিবর্তন হয়ে যায়। এজন্য তালবিয়া ছাড়া অন্যান্য দুআ' যদি সহীশুদ্ধভাবে মুখস্থ না হয় শুধু বাংলা উচ্চারণ দেখে পড়ার চেয়ে অন্তর দিয়ে নিজের ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে দুআ' করা উত্তম হবে।

তালয়িাহ পড়ার সময় কখন শুরু এবং কখন বন্ধ হবে

দেশ থেকে অথবা মক্কা শরীফে অবস্থানকালে উমরার ইহরাম বাঁধার পর থেকে উমরার তাওয়াফে কাবা শরীফ দেখা পর্যন্ত যত বেশী সম্ভব তালবিয়া পড়তে থাকবেন। তাওয়াফ শুরুর পর থেকে উমরা সম্পন্ন করা পর্যন্ত আর তালবিয়া পড়া যাবে না।

তেমনিভাবে হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়া পড়তে থাকবেন। এরপর হজ্জের কাজ সম্পন্ন পর্যন্ত তালবিয়া পড়া যাবে না।

হজ্জ ও উমরার উল্লেখিত সময়ের বাহিরে তালবিয়া পড়া নিষেধ। পুরুষগণ উচ্চস্বরে, মহিলাগন নীরবে যত বেশী সম্ভব তালবিয়া পড়তে থাকুন। সকলে মিলে একসাথে এক আওয়াযে তালবিয়া পড়া নিষেধ।

- ইহরাম বাঁধার পর যে কোন স্থান ও অবস্থার পরিবর্তনে যেমন- নামাযের পরে, কোথায়ও বসলে, দাঁড়ালে, শোয়ার সময়, ঘুম থেকে উঠার সময়, গাড়ীতে উঠার সময়, নামাযের সময়, গাড়ীর সিটে বসা ও উঠার সময়, কারো সাথে সাক্ষাতের সময় যথাসম্ভব বেশি বেশি তালবিয়া পড়বেন।
- এহরাম অবস্থায় বিশেষ করে হজ্জের দিনগুলোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযিলত পূর্ণ যিক্‌র হলো তালবিয়া।
- যখনই তালবিয়া পড়বেন, কমপক্ষে তিনবার এবং পুরুষেরা শব্দ করে পড়া মুস্তাহাব।

হজ্জের অর্থ

হজ্জের শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা। ইসলামের পরিভাষায়, একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে (যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ) কাবা শরীফ ও অন্যান্য স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়।

হজ্জ কাদের উপর ফরয

যাকে আল্লাহ তা'আলা এ পরিমাণ সম্পদ দান করেছেন যে, মক্কা শরীফে আসা-যাওয়া, সেখানে অবস্থান করা, খাওয়া-দাওয়া, প্রয়োজনীয় খরচাদির অতিরিক্ত টাকা থাকে এবং মক্কা শরীফে থাকা কালীন পরিবারবর্গের খরচাদির টাকা থাকে কিংবা এ পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা মালিকানাধীন থাকে অথবা ব্যবসায়িক মালামাল থাকে অথবা এ পরিমাণ অতিরিক্ত মালামাল বা জমি থাকে, তার উপর হজ্জ ফরয। হজ্জ ফরয হওয়ার পর াকারণে দেরী করলে গুনাহগার হবে।

১. মহিলাদেরও যদি ব্যক্তিগতভাবে এ পরিমাণ সম্পদ এবং সাথে মাহরাম থাকে তার উপরও হজ্জ ফরয হয়।

মহিলাদের হজ্জের সফরে মাহরাম থাকা শর্ত

মহিলাদের হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হল, স্বামী বা নির্ভরযোগ্য মাহরামের সাথে হজ্জের সফর করা। যদি সফরের জন্য মাহরাম পাওয়া না যায়, তাহলে মহিলা নিজে মাহরামের হজ্জের খরচ বহন করে সাথে নিয়ে যেতে হবে। যদি সারা জীবন মাহরাম পাওয়া না যায় অথবা মহিলা মাহরামের খরচ বহন করতে সক্ষম না হন, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে বদলী হজ্জের ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। শরীয়ত-ঘোষিত মাহরাম ছাড়া মহিলারা হজ্জের সফর করলে শক্ত কবীরা গুনাহ হবে।

মিথ্যা মাহরাম বানানো

যেহেত হজ্জের ভিসা মাহরাম ছাড়া দেয়া হয় না, তাই অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যাদের সাথে দেখা করা শরীয়তে জায়েয নয়, এমন কাউকে হজ্জ বা উমরাহ ফরমে মাহরাম বানিয়ে হজ্জের সফর করেন। এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া শক্ত গুনাহ এবং পুরা সফরে মাহরাম ছাড়া সফর করার গুনাহে লিপ্ত থাকবে। যার কারণে হজ্জের বরকত থেকে বঞ্চিত হন বরং এভাবে মিথ্যা ও বেপর্দার গুনাহর সাথে হজ্জে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়া ভাল।

হজ্জের ফযিলত

"নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও বিশ্ব জগতের দিশারী।
সুরা আলে ইমরান : ৯৬-৯৭

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং সম্পাদন কালে কোন ধরণের অশালীন কথা ও কাজে কিংবা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি, সে যেন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল"। **বুখারী ১/২০৬; মুসলিম ১/৪৩৬**

"তোমরা একত্রে হজ্জ ও উমরা করো। কেননা ইহা তোমাদের দারিদ্রতা ও পাপ সমূহকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমনিভাবে কামারের ডাঁটি লোহার ময়লা ও সোনা রুপার ময়লাকে দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরুর (ত্রুটি ও গোনাহ মুক্ত কবুল হজ্জ) এর প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।"
মুসলিম শরীফ: ১/৪৩৬; তিরমিযয়: ১৮৬

যে ব্যক্তির প্রকাশ্য শরয়ী কোন ওজর, বা অত্যাচারী শাসক অথবা কঠিন রোগ তাকে হজ্জ পালন হতে বিরত না রাখে, আর হজ্জ আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে, সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক; এতে আল্লাহর কোন দায়িত্ব নাই"।
বুখারী, দারেমী, তিরমিযী ১/১৬৭

হজ্জ ও উমরা পালনকারী আল্লাহ তাআ'লার মেহমান। তাদের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন।

"তুমি যদি বায়তুল্লাহর কোন মুসাফিরকে বিদায় জানাবার সুযোগ পাও, তাহলে খুব মুহাব্বাতের সঙ্গে বিদায় জানিয়ো। কারণ আগামী কাল তার যে দুটি চোখ কালো গিলাফ এবং সবুজ গম্বুজকে দেকবে, সেই চোখ দুটি তুমি দেখতে পারো। আল্লাহর ঘরের গিলাফ স্পর্শ করার হাত দুটির তুমি স্পর্শ গ্রহণ করতে পারো। আল্লাহর ঘরের মেহমান তো আল্লাহর এত প্রিয় যে, তাকে যারা বিদায় জানায়- তাদেরও আল্লাহ ভালবাসেন। হাদীস শরীফে আছে- তোমরা হাজী সাহেবগনের সাথে সাক্ষাৎ কর, তাকে সালাম ও মুসাফাহা কর। ঘরে প্রবেশের পূর্বে দুআ'র আবেদন কর, কেননা সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে এসেছে। **ইবনে মাজাহ, মিশকাতপৃ: ২২৩**

হজ্জ বিষয়ক
কিছু ভুল ধারনা

বালেগ হওয়ার পর যেমনিভাবে নামায, রোযা ফরয, তেমনিভাবে সামর্থ হওয়ার সাথে সাথে হজ্জ ফরয হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে কিছু ভুল ধারনা রয়েছে।

ক. অনেকে মনে করেন, বৃদ্ধ বয়সে হজ্জ করবেন। যৌবনে সামর্থ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও হজ্জে যান না। মূলতঃ পবিত্র হজ্জের সাথে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই বরং যখনই হজ্জ ফরয হয়ে যায় বিনা কারণে দেরী করলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। যদি এভাবে বৃদ্ধ বয়সের অপেক্ষায় থেকে হজ্জ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে হাদীস শরীফে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করার হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বস্তুত শারিরিক শক্তির বিবেচনায় ইবাদতের আত্মিক মজা ও আনন্দ যৌবনেই পাওয়া যায়। কারণ খাঁটি নিয়তে হজ্জ মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। হজ্জ করার পর গুনাহ ছেড়ে দেয়ার আত্মিক আনন্দ যৌবন কালেই পাবে। বৃদ্ধ বয়সে তো মানুষ এমনিতেই গুনাহ ছেড়ে দেয়। কবি বলেন- "বৃদ্ধ বয়সে তো জালেম সিংহও ভাল হয়ে যায়। যৌবনে গুণাহ থেকে তাওবা করা পয়গাম্বরদের স্বভাব"।

খ. অনেকের ধারণা, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে হজ্জে যাওয়া যাবে না; এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিয়ের সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জ ফরয হওয়ার পর নিজের বা ছেলে মেয়ের বিয়ের অজুহাতে হজ্জ করতে দেরী করলেও গুনাহ হবে।

গ. পিতা বা পরিবারের বড়রা হজ্জ না করলে ছোটজন হজ্জ করেন না, এটাও ভুল ধারণা। এ অজুহাতে দেরী করলেও গুনাহগার হবে।

ঘ. পিতা-মাতার উপর হজ্জ ফরয হয়নি; কিন্তু ছেলের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতাকে হজ্জ না করিয়ে বা একসাথে না যাওয়া পর্যন্ত নিজে হজ্জ করেন না। এটিও একটি ভুল ধারণা। এভাবে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। রমযান মাসে পিতার অসুস্থতার দরুন পিতা রোযা রাখতে পারেন না বলে ছেলের ফরয রোযা যেমনিভাবে মাফ হয় না,

তেমনিভাবে হজ্জের বেলায়ও একই হুকুম। এসমস্ত ধারণা শয়তান মনের মধ্যে ঢুযকিয়ে আমাদের গুনাহর রাস্তা খুলে দেয়। তাই হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথেই হজ্জ আদায় করা অতি জরুরী।

হজ্জের নিয়ত করার পর করণীয়

হজ্জের নিয়ত করার পর কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখা চাই।

০১. নিয়্যাত : একমাত্র আল্লাহ তা'আলার একটি বড় হুকুম পালন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিয়্যাতকে খালেস করে নিব। লোক দেখানো, খ্যাতি অর্জন, হাজী উপাধি, অহংকার এসবের কোন কিছুই যেন অন্তরে স্থান না পায়। এজন্য সর্বদা অন্তরকে যাচাই করতে থাকা ও নিয়্যাতকে খালেস রাখা।

০২. তওবা : গুনাহ থেকে তওবা করা হজ্জের সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সফরের পূর্বে খাঁটি দিলে অতীতের কৃতগুনাহ থেকে তওবা করে নিবেন। নিজের গুনাহর কথা স্মরণ করে তওবার নিয়্যতে দু'রাকাআত নামায পড়া উত্তম। এরপর দুরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার পড়ে আন্তরিকভাবে তাওবার উদ্দেশ্য নিয়ে অতীতের গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প ও আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে কান্নাকাটির মাধ্যমে দু'আ করবেন।

০৩. হক্ব ও আমানত : তওবা দুই প্রকার গুনাহ থেকেই করতে হয়।

ক. আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ।

খ. বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ।

ইবাদত বন্দেগীর সাথে সাথে মানুষের পাওনা হক্বের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। কারণ, যার হক্ব তার পক্ষ থেকে ক্ষমা না পেলে ক্ষমা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব, যদি কেউ টাকা পয়সা পাওনা থাকে যথাসম্ভব পরিমোধ করে দিবেন। অন্যথায় সময় নিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। যদি পাওনাদার মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে তার উত্তরসূরীদের সাথে লেনদেন পরিশোধ করে নিবেন। ঠিকানা জানা না থাকার কারণে তা সম্ভব না হলে সমপরিমাণ টাকা সদকা করে দিবেন। যদি কাউকে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে তার থেকে ক্ষমা নিন। সে মৃত্যুবরণ করে থাকলে তার জন্য খুব বেশি করে মাগফিরাত ও গুনাহ মাফের দু'আ করবেন।

০৪. **হালাল উপার্জন:** হালাল পন্থায় উপার্জিত অর্থই হজ্জে ব্যয় করবেন। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের প্রধান শর্ত। হারাম মালের উপর যাকাত এবং হজ্জও ফরয হয়না। তাই শুধু হজ্জের জন্যই নয় বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হালাল উপাজ্ন অপরিহার্য। অন্ততপক্ষে হজ্জের নিয়ত করার পর সারা জীবন হারাম উপার্জন থেকে পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুন। তার জন্য খুব বেশি করে মাগফিরাত ও গুনাহ মাফের দু'আ করবেন।

০৫. **কাযা ইবাদত :** আর যদি অতীতের নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ক্বাযা থাকে তাহলে ক্বাযা আদায় করা শুরু করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্য খাটি অন্তরে তাওবা করে নিন।

কাযা আদায় করার জরুরী মাসআলা

"অতীতের নামাযের কাযা আদায় করতে হয় না, উমরী কাযা বলতে কিছু নেই"

এমন বিভ্রান্তিকর ও অপব্যাখ্যা মূলক কথা অনেককেই বলতে শুনা যায়। এটা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও শরীয়ত বিরোধী কথা। অতএব, কাযা আদায় করার নিয়ম জেনে এখন থেকেই আদায় করা শুরু করে দেয়া জরুরী। হজ্জের সফরে নফল নামাযের চেয়ে কাযা নামায বেশি পড়া উচিত। আসরের পরও কাযা পড়া যায়।

০৬. **পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানাদির হক:** হজ্জে যাওয়ার আগে পিতা-মাতা (যদি জীবিত থাকেন), স্ত্রী ও সন্তানাদির যাবতীয় প্রয়োজন, খোরপোষ ও সার্বিক বিষয়ের সু-ব্যবস্থা করে যাবেন। এটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

০৭. **নেক সফর সঙ্গী:** সফরসঙ্গী হিসাবে ভাল লোকদের বেছে নিবেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বে হজ্জ করেছেন এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হক্কানী আলেম এর সাথে যাওয়াই সর্বোত্তম।

০৮. **হজ্জের মাসায়িল:** অন্যান্য ইবাদতের মত হজ্জে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হারাম-মাকরূহ ইত্যাদি রয়েছে। অধিকাংশ হাজী সাহেবগণ হজ্জের মাসায়েল সম্পর্কে মোটেও জ্ঞান নেন না। আবার অনেককে যে কারো কথায় বা মাসআলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ আলিম/মুআল্লিমের কথায় বা অন্যের দেখাদেখী আমল করতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে হজ্জ ফাসেদ বা দম ওয়াজিব হওয়ার মত ভুল করে থাকেন, অথচ হাজী সাহেবের জানাও থাকে না।

অতএব, হজ্জের নিয়ত করার পর রওয়ানা হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিখে নেওয়া জরুরী। তবে শুধু বই পড়া যথেষ্ট নয়; বরং হক্কানী অভিজ্ঞ আলেমগনের থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া জরুরি। পর্দার ভাল ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদেরও প্রশিক্ষণ নেয়া অতীব জরুরী।

হজ্জের সফরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

০১. হজ্জের পুরো সফরে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি খুব খেয়াল রাখবেন -

ক. সকল আমলের তাৎপর্য ও রুহানিয়াত অনুধাবন করে তা স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখা।

খ. হজ্জ ও হজ্জের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়ে নিজেকে দূর অতীতের মাঝে বিলীন করে দেয়া। কেননা এভাবেই হজ্জের আমলে নূর ও নূরানিয়াত পয়দা হতে পারে।

গ. সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর ভাব ও ভাবনা এবং আবেগ ও অনুভূতির মাঝে নিজেকে নিমগ্ন রাখা।

"আমার প্রিয় ভাইয়েরা! এ সফরে সাবধান! বর্তমানের ধাঁধায় হারিয়ে যেয়োনা। আসমান ছোয়া ইমারত ও দালান কোঠায় বিভ্রান্ত হয়োনা। দোকানে দোকানো সাজানো পণ্য-সম্ভার ও স্বর্ণালংকার দেখে বুলে যেয়ো না, তোমার লক্ষ্য আজকের মক্কা মদীনা নয়। অতীতের মক্কা মদীনা। বাইরের চোখ বন্ধ করে ভিতরের চোখ খুলে দেখো। সময়ের পর্দা সরে যাবে এবং অতীতের রাজপথ ধরে তুমি পৌঁছে যাবে নূরানী যুগের মক্কা-মদীনায়। তখন তুমি ধন্য হবে এবং তোমার প্রাপ্তির পাত্র পূর্ণ হবে। এই যে বারবার বলছি সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করে বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়ার কথা, এটা কিন্তু আমার নিজের কথা নয়; এটা শুধু বড়দের কথা বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেয়া। বলা বাহুল্য এ তিনটি বিষয় হজ্জের মধ্যে রূহ ও রূহানিয়াত পয়দা করে। খুশু-খুজু এবং হজ্জের ঈমানী ও বাতেনী সুফল অর্জন করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপায়। অথচ আজকাল হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদতের রূহ ও রূহানিয়াত সম্পর্কে আলোচনা আমাদের মাঝে অনেক কমে গেছে।"
(বায়তুল্লাহর মুসাফির)

০২. **হজ্জে মাবরুর :** হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হজ্জে মাবরুরের বিনিময় একমাত্র জান্নাত।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত: ২২১) অতএব, আমার এ হজ্জটি কিভাবে হাদীসে উল্লেখিত ফযিলতপূর্ণ হজ্জে মাবরুর হয় সে ব্যাপারে সবসময় খেয়াল করা এবং বেশী বেশী করে দু'আ করা চাই।

- কোন কোন আলেমের মত- হজ্জে মাবরুর হচ্ছে, এমন হজ্জ, যে হজ্জে কোন গুনাহ হয় না। সহীহ নিয়তে হজ্জের নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থেকে হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে মাবরুর বলে।
- কারো মতে মাকবুল হজ্জকে হজ্জে মাবরুর বলা হয়।
- কারো মতে যে হজ্জ লোক দেখানো, আত্ম-প্রচারনা থেকে মুক্ত থাকে।
- কেহ কেহ বলেন, যে হজ্জের পর গুনাহ ছেড়ে দেয়া হয়।
- হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যে হজ্জের পর দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে ও আখিরাতের প্রতি মন ধাবিত হতে থাকে।

০৩. নামায ও জামাতের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিবেন। পুরুষদের কোন অবস্থায় যেন এক ওয়াক্ত নামাযও জামাআতে পড়া ও তাকবীরে উলা (ইমামের সাথে সাথে নিয়ত বাধা) ছাড়া পড়া না হয় বিশেষ করে গাড়ি বা প্লেনে কোন ভাবেই যেন নামায কাযা না হয়।

০৪. এই সফরে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, আউয়াবীনসহ বেশী বেশী নফল নামায পড়ার চেষ্টা করা। যদি কাযা নামায থাকে তাহলে নফল নামায পড়ে কাযা নামায আদায়ের নিয়ম ও সময় জেনে প্রতি নামাযের আগে পড়ে বেশী বেশী কাযা নামায আদায় করবেন।

আসরের পর নফল ও কাযা নামায পড়ার হুকুম

আসরের পর কোন নফল এমনকি তাওয়াফের দুরাকাআত নামাযও পড়া যাবে না। তবে আসরের পর কাযা নামায পড়া যাবে। আসরের পর তাওয়াফ করলে মাগরিবের পূর্বে তাওয়াফের দুই রাকাত পড়া যাবে না বরং মাগরিবের পরে তাওয়াফের দুই রাকাআত পড়বেন।

০৫. যত বেশি সম্ভব, হারাম শরীফে সময় বেশী ব্যয় করুন। হয়ত জীবনে এ সুযোগ আর আসবে না।

০৬. এই সফরে যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবেন। কোথাও ক্যামেরা, মোবাইল/ভিডিওতে ছবি তুলে আল্লাহর ঘর এবং রওযা আতহারের মত পবিত্র স্থানে গুনাহ করার দুঃসাহস দেখাবেন না। অন্যদের দেখাদেখী গুনাহ করে মুবারক সফরে বঞ্চিত হয়ে যেন ফিরতে না হয়।

০৭. **চোখের হেফাযত ও পর্দা :** সর্বদা নিজের দৃষ্টি নিচে রাখার চেষ্টা করবেন। বেগানা মহিলাদের দিকে যেন দৃষ্টি না পড়ে সেদিকে খুব খেয়াল রাখবেন। বে-খেয়ালে দৃষ্টি পড়ে গেলে, সাথে সাথে দৃষ্টি অবনত করে ফেলবেন। এমনকি প্লেনেও যে কোন প্রয়োজনে পুরুষ সেবকের সাহায্য নিবেন। মহিলা সেবিকা থেকে পর্যন্ত নযরের হেফাযত করার চেষ্টা করবেন।

হজ্জের সফরে চোখের হেফাযত করতে পারা হজ্জ কবুল হওয়ার বড় আলামত

তাই সর্বদা বদ নযর ও বদ চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। মনে রাখবেন, এখানে মহিলারাও আল্লাহর খাস মেহমান। যদিও বেপর্দার কারণে মহিলারা গুনাহগার হবেন, কিন্তু আল্লাহর মেহমানদের প্রতি কুদৃষ্টি মেজবান-আল্লাহ কিভাবে সহ্য করবেন ?

০৮. **চরম ভুল ধারণা :** হজ্জের সফরে অনেককে পর্দাসহ বিভিন্ন মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেক অবহেলা করতে দেখা যায়। বরং অনেকে তো মহিলাদের সাথে একত্রে নামায পড়া, হোটেলে পর্দা করা ইত্যাদি জরুরী মাসআলায় বেশ অবহেলা করেন। উপরন্ত নিষেধ করলে নির্দিধায় বলে দেন যে, হারাম শরীফে আল্লাহ সব মাফ করে দিবেন। এমন জঘন্য কথা থেকে সতর্ক থাকা চাই। কারণ, এমন পবিত্র স্থানে বরং গুনাহ করার অভিশাপ আরো বেশী। হজ্জের সফরেও যদি জীবনের পরিবর্তন না আসে তাহলে তা অনেক বড় ভয়ের কারণ।

০৯. হজ্জের সফরে ভিড়ের মধ্যে একথা খুব খেয়াল রাখবেন, যেন আল্লাহর কোন বান্দার কষ্ট না হয়। কারণ মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।

১০. ভিড়ের সময় বিশেষ দু'আ- ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না করে ধীরস্থীরভাবে চলবেন। ভীড়ের সময়-

اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ-

(আল্লাহুম্মা ওয়াক্বিয়াতান কাওয়াক্বিয়াতিল ওয়ালীদ)

এই দু'আ পড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবেন। ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা গায়েব থেকে সাহায্য করবেন। এটি বুযুর্গদের পরীক্ষিত দু'আ ও আমল। (হাজারে আসওয়াদ এবং মুলতাযামে প্রচণ্ড ভিড়েও আমি

(লেখক) অনেক বার আল্লাহর সাহায্য পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ।

বায়তুল্লাহর মুসাফিরে হযরত লিখেন,

> "আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে বায়তুল্লাহর মাতাফে মুলতাযামের পথে হযরত (হাফেজ্জী হুযুর রহ.) এ দুআ'টি শিখিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও এর উপর আমল করছি। আর আল্লাহ আমার উপর সাহায্য করেছেন এবং রক্ষা করেছেন। এ রক্ষাকবচ মৃত্যুর সময় শয়তানের হামলা থেকেও যেন রক্ষা করে, তখনও যেন আল্লাহ সাহায্য করেন; যারা আমীন বলবে তাদেরও।" **(বায়তুল্লাহর মুসাফির)**

১১. এ সফরে অসুখ-বিসুখ, বিভিন্ন অব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় বিষয়ে ধৈর্য্য ও সবরের উপর আমল করার চেষ্টা করা। কথা কাটা-কাটি, ঝগড়া-বিবাদ, গীবত, অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকুন। গীবত করা কবীরা গুনাহ। গীবত বলা হয়, কারো অগোচরে এমন কথা বলা, যা সে শুনলে মনে কষ্ট পাবে, যদিও তা সত্য কথা হয়।

১২. সাথী-সঙ্গীদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করা। কথা বার্তা, চলা-ফেরায় অন্যদের থেকে আপনি যে ব্যবহার আশা করেন– আপনিও সকলের সাথে সেরূপ ব্যবহার করুন।

১৩. হজ্জের সফরে আবশ্যকীয় দুটি গুণ

১. ধৈর্য ধারণ করা:

হজ্জের সফরে ট্রাভেল এজেন্সি ও মুআল্লেমদের কার্যকলাপ, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, সময়মত গাড়ি না আসা, মিনা-আরাফা ও মুজদালিফায় অনাকাঙ্ক্ষিত কষ্ট, খাওয়া-দাওয়ার ত্রুটিসহ অনেক কিছুই মনের বিপরীত হতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে অধৈর্য্য হওয়া যাবে না। বিশেষ করে ইহরাম অবস্থায় কোনভাবেই রাগারাগি, ঝগড়া-বিবাদে জড়ানো যাবে না। তাতে পেরেশানী আরো বেড়ে যায়। ফলে হজ্জের কাজ সঠিকভাবে পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবদের কষ্ট দিবেন– অবশ্যই এর ফল দুনিয়াতেই ভোগ করতে হবে। এবং যার কারণে শক্ত গুনাহগার হবেন। তাই এ বিষয়গুলো আল্লাহর উপর সোপর্দ করে নিজের আমলের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

২. ক্ষমা করা: হজ্জের সফরে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিবেচক-অবিবেচক,

শান্ত-অশান্ত, বিভিন্ন চরিত্রের লোক থাকবে। অতএব, সাথীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অসংখ্য ভুলত্রুটি চোখে ধরা পড়বে। এসব ক্ষেত্রে উদার ও বড়মনের পরিচয় দিয়ে এবং বায়তুল্লাহর মেহমানদের সম্মান দেখিয়ে ক্ষমা করে দেয়ার মহান আখলাক প্রদর্শন করার চেষ্টা করবেন। এদুটি গুণের বিনিময়ে আপনার মর্যাদা আল্লাহর দরবারে উচু স্থানে পৌঁছবে এবং আপনি তাক্বওয়ার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবেন। যা হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম।

১৪. এ সফরে প্রয়োজনীয় খরচের ব্যাপারে কার্পণ্যতা করবেন না, আবার অপব্যয়ও যেন না হয়।

১৫. সর্বদা সাথীদের খিদমাত করার চেষ্টা করবেন। এ সফরে সাথীদের জন্য ব্যয় করা আল্লাহর রাস্তায় দান হিসাবে গণ্য হয়

১৬. স্বাস্থের প্রতি সর্বদা যত্নবান থাকুন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন থাকুন।

১৭. সামানাপত্র যত হালকা নেয়া যায় ততই ভাল এবং আসার সময় বিদেশফেরৎ যাত্রীদের মতো কেনা কাটা না করা চাই। এভাবে মালামালের ওযন অনেক বেড়ে যায়, যার দরূন অনেক সময় এয়ারপোর্টে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় বা গুষ লেনদেন করতে হয় যা কবীরা গুনাহ।

১৮. এয়ারপোর্টে অবৈধ, নিষিদ্ধ বা গুনাহের বস্তু আনা-নেওয়া, মালামালের ওযনে বা কোন বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই। হজ্জের সফরেও ঘুষ দেয়া বা মিথ্যা আশ্রয় নেয়া জঘন্য অপরাধ। উপরন্তু হজ্জের সফরেই যদি এ জাতীয় গুনাহর ব্যাপারে ভয় না করি, তাহলে বাকী জীবনে আল্লাহর ভয় কিভাবে আসবে?

১৯. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রওয়ানা হওয়ার সময় যথা সময়ে তৈরী হয়ে থাকবেন, যাতে অন্যান্য সাথীদের অপেক্ষার কষ্ট না হয়।

২০. প্লেনের টিকেট কাগজপত্র ও টাকা পয়সা অত্যন্ত সতর্কভাবে রাখবেন, নতুবা অনেক বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। জিদ্দায় আপনার থেকে পাসপোর্ট নিয়ে নিবে। হজ্জ ক্যাম্পে পৌঁছে আপনি অবশ্যই পাসপোর্ট থেকে প্লেনের টিকেটটি আলাদা করে নিজের কাছে রেখে দিবেন। ভুলে আপনার টিকেট পাসপোর্টের সাথে চলে গেলে বড় সমস্যায় পড়তে পারেন। সবচেয়ে উত্তম হল দেশ থেকেই পাসপোর্ট, টিকেটসহ যাবতীয় কাগজপত্র ফটোকপি করে বা মোবাইলে ছবি তোলে রাখা।

মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে
দৈনন্দিন আমলের রুটিন

পবিত্র হজ্জের এ সফরের প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমলের মধ্যে কাটে সেদিকে হাজী সাহেবগণের খুব লক্ষ্য রাখা চাই। এজন্য কিছু তারতীব ও আমল বলা হচ্ছে- আশা করি এভাবে আমল করতে পারলে সফর বরকতময় হবে এবং সময়গুলো অনর্থক নষ্ট হবে না।

- মক্কা শরীফ অবস্থান কালীন তাওয়াফের চেয়ে ফযিলতপূর্ণ কোন ইবাদত নেই। তাই প্রতিদিন যতবেশী সম্ভব এবং প্রচন্ড ভিড়ের দিনগুলোতে দৈনিক কমপক্ষে একটি হলেও তাওয়াফ করার চেষ্টো করবেন।

- মদীনা শরীফ অবস্থান কালীন সময় যত বেশী সম্ভব রওযা শরীফের যিয়ারত করার চেষ্টা করবেন। বাকী সময়গুলো রুটিন মাফিক ইবাদত বন্দিগীতে সময় ব্যয় করতে চেষ্টা করবেন।

- এশার পর খানা খেয়ে গল্প গুজব, ঘুরাফেরায় লিপ্ত না হয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বেন যাতে ভোর রাত্রে উঠতে কষ্ট না হয়।

- ঘুম থেকে তাহাজ্জুদের সময় ওঠে ওযু-ইস্তিঞ্জা সেরে ফজরের আযানের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে হারাম শরীফে গিয়ে তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করবেন। আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে এ সফরে তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস করে নিবেন। তাহাজ্জুদের সময় দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্ত।

- তাহাজ্জুদ পড়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে কান্নাকাটির সাথে দু'আ করবেন। কান্না না আসলে কান্নার ভান করবেন। কান্না ছাড়া ছোট শিশুও মায়ের দুধ পায় না। অন্য কোন ইবাদতে ভান করার অনুমতি নেই, একমাত্র কান্নাকাটির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভান করার কথা বলেছেন।

- এ সফর থেকেই দীর্ঘ সময় নিয়ে দু'আর অভ্যাস যেন হয়ে যায়। অন্যান্য সময়ও যেমন মাগরিবের পূর্বক্ষণে এবং বিশেষ সময়গুলোতে দীর্ঘ সময় কান্নাকাটির সাথে প্রতিদিন দু'আর খুব আমল করবেন। আযান-ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, ফরয নামাযের পর পর দোআ কবুলের বিশেষ সময়।

- ফজরের আগে তাহাজ্জুদ পড়ে সময় থাকলে এবং ফজরের পর এশরাক

পর্যন্ত কুরআনে পাক তিলাওয়াত ও যিক্‌র-আযকারে লিপ্ত থাকবেন। সম্ভব হলে তাওয়াফ করুন, তবে এশরাকের পূর্বে তাওয়াফের নামায বা অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে না।

- এশরাকের সময় হলে (হারামাইন শরীফে ফজরের আযান থেকে কমপক্ষে ১ ঘন্টা ৩০ মিঃ পর) এশরাক নামায পড়ে কামরায় এসে নাস্তার পর ঘুম, গোসলসহ যাবতীয় প্রয়োজন সেরে নিবেন। যোহরের আযানের কমপেক্ষ ৩০ মিনিট পূর্বে হারাম শরীফে চলে যাবেন। যোহর আদায় করে দুপুরে খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে কামরায় চলে আসবেন।

- যে কোন আযানের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বেই মসজিদে না পৌঁছলে রাস্তায় নামাজ পড়তে হবে। এ সফরের প্রতিটি নামাজ যেন তাকবীরে উলার সাথে মসজিদের ভিতর বরং এমন স্থানে যেখানে কাবা শরীফ নযরে পড়ে এতমিনানের সাথে যেন পড়া হয় এ ব্যাপারে খুব সচেষ্ট থাকবেন। অনেকেই মাঠে বা রাস্তায় দাঁড়িযে যেতে দেখা যায়। হারামের বারান্দার বাইরে সামনে খালি রেখে দাঁড়ালে অনেক ক্ষেত্রে নামায সহিহ হয় না।

- আসর ও মাগরিবের আযানের পূর্বেই মসজিদে চলে আসবেন, সম্ভব হলে আসর থেকে ইশা মসিজদে হারামে অবস্থান করে তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকার ও ক্বাযা নামায থাকলে সেগুলো আদায় করবেন।

- যারা সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন। পুরো সফরে কয়েক খতম না হয়, কমপক্ষে এক খতম কুরআন শরীফ পড়ার চেষ্টা করবেন। কুরআন নাযিলের শহর মক্কা ও মদীনা শরীফে তেলাওয়াতের প্রতি খুব গুরুত্ব দিবেন।

- যত বেশী সম্ভব নিজের জন্য এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নফল তাওয়াফ করবেন। হজ্জের মাসে তাওয়াফের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই।

- প্রতি নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার,

  ফজর ও মাগরিবের পর ১০০ বার

سُبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ للهِ ولاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ

সুবহানাল্ল-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

সুবহানাল্ল-হি ওয়াবিহামদিহি- সুবহানাল্ল-হিল আযী-ম।

- দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার দরূদ শরীফ, ১০০ বার আসতাগফিরুল্লাহ।

(اَسْتَغْفِرُ اللهِ الَّذِىْ لَا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ)

উচ্চারণ

আসতাগফিরুল্ল-হাল্লাযি- লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হায়্যিল কায়্যুম ওয়াআতু-বু ইলাইহ।

- **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ**

উচ্চারণ

লা-হাওলা ওয়ালা- কুওওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ

দৈনিক যত শত বা হাজার বার সম্ভব, পড়ার চেষ্টা করবেন। কারণ হাদিসে এ আমলকে জান্নাতের ভান্ডার বলা হয়েছে।

- ফজর ও মাগরিবের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এবং ৭ বার

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা আজিরনী- মিনান্না-র

অর্থ

হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।

- ফজরের পর সূরা ইয়াছিন, মাগরিবের পর সূরা ওয়াক্বিয়াহ, এশার পর সূরা মূলক ইত্যাদি দৈনিক নিয়মিত তিলাওয়াত করার চেষ্টা করবেন।

- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রতি নামাযের পর একবার করে পড়বেন। এবং মাগরিব ও ফজরের পর তিনবার পড়ে শরীরে দম করবেন। এটা হাদিসে বর্ণিত আমল।

দুরুদ শরীফের আমল

এছাড়া দৈনিক যতবেশী সম্ভব দরূদ শরীফ পড়বেন। বড় দরূদ সম্ভব না হলে শুধু "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" পড়বেন। এ দুরূদটি হাদীসের প্রতিটি কিতাবে প্রতিটি হাদীসের সাথে উল্লেখ রয়েছে। হারাম শরীফে আসা-যাওয়ার সময় অযথা কথা-বার্তা না বলে, ছোট এই দরূদটি দৈনিক কয়েক হাজার বার পড়া সম্ভব। প্রতি ওয়াক্ত নামাযে আসা যাওয়ার সময় রাস্তায় অযথা কথাবার্তা না বলে এবং নামাযের আগে পরে রুটিন বানিয়ে কমপক্ষে ১০০০ (এক হাজার) বার দরূদ পড়ার নিয়ত করলে মোটেও কঠিন নয়। এভাবে পাঁচ ওয়াক্তে হিসাব করে পড়লে দৈনিক কমপক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বার পড়া হয়ে যায়। যদি মনের সংকল্প থাকে, নিয়মিত আমল করতে পারলে এভাবে পুরা হজ্জের সফরে দেড়-দুই লক্ষ বার দরূদ শরীফ পাঠ করা হবে। তেমনিভাবে বিল্ডিং এ অবস্থান কালীন সময় ও হারাম শরীফে অলস বসে না থেকে দৈনিক কয়েক শত বা হাজার বার কালেমা তৈয়্যবার যিকর, এস্তেগফারের আমল করা কঠিন কিছু নয়। একটু খেয়াল করলে জীবনের অনেক বড় পুঁজি নিয়ে ফিরতে পারেন।

সালাতুত্ তাসবীহ্

সম্ভব হলে মাঝে মধ্যে সালাতুত্ তাসবীহ্ পড়বেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস (রা.) কে এরশাদ করেন যে, এ নামায দ্বারা আগে-পরে, নতুন-পুরাতন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, গোপনে-প্রকাশ্যে কৃত সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যদি সম্ভব হয় দৈনিক একবার, নতুবা সপ্তাহে একবার, নতুবা মাসে একবার, নতুবা বছরে একবার, তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার হলেও পড়ে নিবেন।

(মিশকাত, সুনানে আবী দাউদ ১/১৮৩,১৮৪)

পড়ার নিয়ম

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

উচ্চারণ

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার।

চার রাকাআত নামাযের নিয়ত করে সূরা ফাতেহা ও ক্বিরাত পড়ার পর উপরোক্ত দু'আ ১৫ বার, রুকুতে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, রুকু থেকে

উঠে ১০ বার, প্রথম সিজদায় তাসবীহর পর ১০ বার, সেজদা থেকে বসে ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদায় ১০বার, দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার এভাবে প্রতি রাকাতে মোট ৭৫ বার হলো। এভাবে চার রাকাতে ৭৫৪=৩০০ তিনশত বার পড়বেন। (আবু দাউদ ১/১৮৪) খুব খেয়াল করে করে তাসবীহ পড়বেন, যাতে কোন প্রকার ভুল না হয়। কোন রুকনে তাসবীহ পড়া ভুলে গেলে নিকটতম রুকনে তা পূরণ করে নিবেন।

মসজিদে হারামে
নামাযে জানাযা

যারা সালাতুল জানাযার নিয়ম ও দুআ' জানেন না তারা অবশ্যই হজ্জে যাওয়ার পূর্বে জানাযা নামাযের নিয়মাবলী ও দু'আগুলো অবশ্যই শিখে নিবেন। কেননা, হারাম শরীফে প্রায় প্রতি ওয়াক্তেই জানাযার নামায পড়া হয়। আপনি যেন হারাম শরীফের জানাযা নামাযের পরিপূর্ণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত না হন।

সালাতুল জানাযার নিয়ম

- প্রথমে মনে মনে নিয়ত করবেন।
- মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরী নয়।
- জানাযার নামায চার তাকবীরে পড়তে হয়।
- নিয়ত করে ইমামের প্রথম তাকবিরের সাথে আপনিও আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবেন।
- প্রথম তাকবীরে হাত বাঁধার পর সানা পড়বেন।
- দ্বিতীয় তাকবীরের পর নামাযের দরূদ (ইব্রাহিমী) পড়বেন।
- তৃতীয় তাকবীরের পর জানাযার দুআ' পড়বেন।
- চতুর্থ তাকবীরের পর উভয় দিকে সালাম ফিরাবেন।
- যদিও মাজহাবগত কারণে সেখানে শুধু ডানদিকে সালাম ফিরানো হয়। ইমামের পর আপনি নিজে নিজে বামদিকে সালাম ফিরাবেন।

মাযহাবের ভিন্নতা

মাযহাবের ভিন্নতার কারণে আরবরা প্রতি তাকবীরে হাত উঠান এবং একদিকে সালাম ফিরান। এ জাতীয় মাসআলাগুলোতে আমরা যেন বিচলিত ও বিভ্রান্ত না হই। হক্কানী উলামায়ে কেরামদের থেকে জেনে হজ্জের যাবতীয় আমলগুলো আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে আমল করাই বাঞ্চনীয়।

ফরয নামাযের সালাম ফিরোনোর পর মাইকে পুরুষ/মহিলা/শিশু/বালিগ/নাবালিগ কার জানাযা তা এলান হয়। আরবী ঘোষণা না বুঝলে নিকটস্থ কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন।

তবে আরবী কয়েকটি শব্দ শিখে নিলে নিজে ঘোষণা বুঝা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যেমন:

- মাইয়্যেত যদি একজন পুরুষ হয়- **আস্ সালাতু আলাল মাইয়্যিতি।**
- যদি একজন মহিলা হয়- **আস্সালাতু আলাল মাইতাতি।**
- যদি শুধু একাধিক পুরুষ হয়- **আসসালাতু আলার রিজাল।**
- যদি শুধু একাধিক মহিলা হয়- **আস্সালাতু আলান নিসা-ই।**
- যদি একজন শিশু হয়- **আস্ সালাতু আলাত ত্বিফলি।**
- যদি একাধিক শিশু হয়- **আস সালাতু আলাল আত্বফাল।**

বালেগ পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে দুআ'

اَللّٰهُمْ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ.

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উংছানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহইহী আলাল ইসলাম ওয়া মাং তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।

ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে দুআ'

اَللّٰهُمَ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا.

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারাতাওঁ ওয়াজ আলহুলানা আজরাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ আলহুলানা শাফিআওঁ ওয়ামুশাফ্ফাআ।

মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে দুআ'

اَللّٰهُمَ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً.

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মাজ আলহা লানা ফারাতাওঁ ওয়াজ আলহালানা আজরাওঁ ওয়া যুখরা ওয়াজ আলহালানা শাফিআতাওঁ ওয়ামুশাফ্ফাআহ।

জানাযার পূর্বে দ্রুত সুন্নাত পড়া

ফরয নামাজের পর জানাযা শুরু করতে অনেক সময় ৫/৬ মিনিট পর্যন্ত দেরী হয়। তখন অনেককে তাড়াহুড়া করে সুন্নত পড়তে দেখা যায়। এমন করা ঠিক নয়। বরং জানাযার জন্য অপেক্ষা করে জানাযা শেষ হওয়ার পর সুন্নত পড়া চাই। তবে যদি অনেক দেরী হয় এবং ধীরস্থি'রে সুন্নাত পড়ার সুযোগ থাকে তাহলে জানাযার পূর্বে সুন্নাত পড়ে নিলে অসুবিধা নেই।

মহিলাদের জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ

মহিলাদের জন্য জানাযায় অংশগ্রহণ করা মাকরূহ। অবশ্য যদি জানাযার নামায পড়ে, তাহলে সহিহ হয়ে যাবে।

বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তাবরানী, রদ্দুল মুহতার-১/৮১২

তাই যে সকল মহিলা হারাম শরীফে নামায আদায় করবেন, তারা জানাযা না পড়া চাই।

আযান ও ইক্বামাতের জওয়াব

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযানের উত্তর দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি আযানের পর দরূদ শরীফ পড়ে আযানের নির্ধারিত দু'আ পড়বে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। **(মিশকাত-৬৪-৬৫)**

তাই খেয়াল করে প্রতি ওয়াক্তের আযান, ইকামাতের জাওয়াব ও দু'আ

পড়ার অভ্যাস যেন করে নেই। যাদের জানা নেই জওয়াব ও দুআ' শিখে নিবেন। কারণ, আযান শুরু হলে তিলাওয়াত,. যিক্‌র, তাসবীহ পর্যন্ত বন্ধ করে আযানের জওয়াব দেয়ার হুকুম। প্রতি ওয়াক্তেই আমরা আযান ও ইক্বামাত শুনি অথচ অবহেলা বশত আযান ইক্বামাতের জওয়াব এবং এরপর দুআ' পড়া হয় না। এত বড় ফযিলতের আমল যেন পবিত্র সফরে ছুটে না যায়, খুব খেয়াল করা উচিত।

আযানের জওয়াব

মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের শব্দগুলো হুবহু বলবে। শুধু হাইয়্যাআলাসসালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার পর 'লা হাওয়া ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে। আর ফজরের আযানে 'আসসালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' এর জাওয়াবে সাদাক্বতা ওয়া বারারতা' বলবে।

আযানের দুআ'

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰـــوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল ক্বায়িমাহ আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযিলাহ্ ওয়াবআছহু মাক্বামাম্মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআ'ত্তাহ ইন্নাকা লাতুখলিফুল মীআ'দ।

ইক্বামতের জাওয়াব

আযানের জওয়াবের মতই ইক্বামাতের জওয়াব দিবে। শুধু قد قامت الصلوة (ক্বাদক্বামাতিস সালাহ) এর জওয়াবে اقامها الله وادامها. (আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা) বলবে।

হজ্জের সফরে
প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষা

১. **ইহরাম** : হজ্জ ও উমরার নিয়ত করা এবং তালবিয়া মুখে পড়া।

২. **তালবিয়া** : **লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ...** যা ইহ্‌রাম অবস্থায় পড়া হয়।

৩. **হারাম শরীফ :** কাবা শরীফের চতুর্দিক ঘিরে যে বিশাল মসজিদ রয়েছে তা মসজিদে হারাম বা হারাম শরীফ।

৪. **হারামের সীমানা :** মসজিদে হারামের চতুর্দিকে কিছু নির্দিষ্ট এলাকা। একদিকে মসজিদে আয়েশা পর্যন্ত ৭.৫ কি.মি, অন্যদিকে নাখলাহ পর্যন্ত ১৩ কি.মি., ইজা'আতে লাবন পর্যন্ত ১৬ কি.মি., জি'ইররানা পর্যন্ত ২২ কি.মি., হুদায়বিয়া পর্যন্ত ২২ কি.মি. এবং আরাফা পর্যন্ত ২২ কি.মি.।

যে সীমানার ভিতরে অমুসলিম ব্যক্তির প্রবেশ, যুদ্ধ করা, পশুপাখি শিকার করা, গাছ কাটা ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

৫. **মীক্বাত:** হজ্জ বা উমরার নিয়তে মক্কা শরীফ প্রবেশের জন্য যে স্থান ইহরাম ছাড়া অতিক্রম করা জায়েয নেই। যেমন বাংলাদেশীদের জন্য কারনুল মানাযিল বা যাতু ইরাক্ব যা বিমানে জিদ্দা পৌঁছার আধা ঘন্টা পূর্বে অতিক্রম করে।

৬. **হিল:** মীকাত সীমানা এবং হেরেম সীমানার মধ্যবর্তী স্থান। যেমন বাংলাদেশীদের জন্য যাতু ইরাক্বের পর থেকে জিদ্দাসহ আয়েশা মসজিদ পর্যন্ত হিল। এখানে বসবাসকারীরা নিজ ঘর থেকে এহরাম বাঁধতে পারবেন।

৭. **তাওয়াফ:** নিয়ত করে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) বরাবর থেকে শুরু করে কাবা শরীফের চতুর্দিকে সাত চক্কর লাগানো।

৮. **ইসতিলাম:** তাওয়াফের শুরুতে এবং প্রতি চ্করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া, চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাত স্পর্শ করা। তাও সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু দেওয়া।

৯. **ইযতিবা:** যে তাওয়াফের পর সাঈ আছে সে তাওয়াফের সাত চক্করে ইহরাম অবস্থায় পুরুষেরা ইহরামের উপরের কাপড় ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রাখাকে ইযতিবা বলে। তবে যে তাওয়াফের পর সাঈ নেই সে তাওয়াফে ইযতিবাও নেই।

১০. **রমল :** যে তাওয়াফের পর সাঈ থাকে সে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে কিছু দ্রুত ও বীরদর্পে চলা।

১১. **মুলতাযাম:** হাজরে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার মাঝখানের দেওয়াল। এখানে দুআ' খুব বেশী কবুল হয়।

১২. **রুকনে ইয়ামানী:** বায়তুল্লাহ শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ, যেখানে ভীড় না থাকলে তওয়াফ অবস্থায় হাতে স্পর্শ করার হুকুম বর্ণনায় পাওয়া যায় তবে চুমু দেওয়ার নিয়ম নেই।

১৩. **হাতীম:** বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর দিকে গলা বরাবর ঘেরাও করা দেওয়ালের ভিতরের অংশ। এটা মূলত কাবা ঘরের অংশ। তাই এই সীমানার ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করলে আদায় হবে না। এখানে নামায পড়লে কাবা শরীফের ভিতরে নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। এখানে খুব দুআ কবুল হয়।

১৪. **মীযাবে রহমাত:** হাতীমের দিক দিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর দিকের ছাদ থেকে পানি বের হওয়ার যে পাইপ লাইন, এর নিচেও দুআ কবুল হয়।

১৫. **তাওয়াফে যিয়ারাত:** হজ্বের ফরয তাওয়াফ। যিলহাজ্বের ১০, ১১, ১২ তারিখের সূর্যাস্তের ভিতরে এ তাওয়াফ করতে হয়।

১৬. **উকূফ:** উকূফ অর্থ অবস্থান করা। ৯ তারিখ দিনে আরাফার ময়দানে অবস্থানকে উকূফে আরাফা (ফরয) এবং এ দিন দিবাগত রাতে মুযাদালিফায় অবস্থানকে (ওয়াজিব) উকূফে মুযদালিফা বলে।

১৭. **জামরাহ:** মীনায় তিনটি স্তম্ভে কংকর নিক্ষেপের স্থানকে জামরা বলা হয় এর বহুবচন জামারাত।

১৮. **মাতাফ:** তাওয়াফ করার স্থান। কাবা শরীফ এবং মসজিদে হারামের মধ্যবর্তী উন্মুক্ত স্থানকে মাতাফ বলা হয়, যেখানে হাজী সাহেবগন তাওয়াফ করেন।

১৯. **সাঈ:** তাওয়াফ শেষ করার পর সাফা-মারওয়ায় সাত চক্কর দেওয়াকে সাঈ বলে।

২০. **দম :** উমরা ও হজ্জ পালনে কোন ত্রুটি হলে বা ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেললে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি ছাগল-দুম্বা বা উট গরুর সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী করাকে দম বলে। এর কম ক্ষতিপূরণকে সাদকা বলা হয়। যা এক দুই রিয়ালও হতে পারে। আর যে ভুলের কারণে একটি উট বা গরু কোরবানী দিতে হয় তাকে বাদানা বলা হয়।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার

০১. হজ্জে ইফরাদ: শুধুমাত্র হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ঐ ইহরামেই হজ্জের আমলগুলো সম্পাদন করা। হজ্জের পূর্বে কোন উমরা করা যাবে না ও ইহরাম খোলা যাবে না। ইফরাদ পালনকারী ব্যক্তির জন্য কুরবানী মুস্তাহাব।

০২. হজ্জে তামাত্তু : শুধুমাত্র উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে উমরা সম্পাদন করে হলক্ব বা ক্বসর করে হালাল হয়ে যাবে। তারপর সেই সফরেই ৭ বা ৮ যিলহজ্জ হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পন্ন করা। তামাত্তু পালনকারীর জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব।

০৩. হজ্জে ক্বিরান: একই ইহরামে উমরাহ ও হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ঐ ইহরামেই উমরাহ আদায় করে হালাল না হয়ে হজ্জের সময় হজ্জ আদায় করা। ক্বিরান হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী ওয়াজিব।

হজ্জের ফরয তিনটি

০১. ইহরাম বাঁধা। ০২. ওকূফে আরাফাহ্: ৯ যিলহজ্জ দ্বিপ্রহর থেকে ১০ তারিখের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় (এক মুহূর্তের জন্য হলেও) আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। **০৩. তাওয়াফে যিয়ারত :** ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের ভিতর তাওয়াফ করা ফরজ।

হজ্জের ওয়াজিব মূলত ছয়টি

০১. মুযদালিফায় অবস্থান করা। (১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের পর কিছু সময়ের জন্য হলেও) **০২.** সাফা ও মারওয়ার সাঈ করা। **০৩.** নির্দিষ্ট দিনে রমী (কংকর নিক্ষেপ) করা। **০৪.** ক্বিরান ও তামাত্তু পালনকারীর জন্য কুরবানী করা। **০৫.** হলক্ব বা কসর করা। **০৬.** মীকাতের বাহির থেকে আগত লোকদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা।

এছাড়াও কিছু কাজ করা ওয়াজিব

০৭. মুযদালিফায় মাগরিব এবং ইশার নামায ইশার ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা। **০৮.** দশ তারিখ প্রথম কংকর নিক্ষেপ করা। কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানী করা, কুরবানীর পর হলক করা। এ তিনটি আমল যেমনিভাবে ওয়াজিব তেমনিভাবে এগুলো ধারাবাহিকভাবে করাও ওয়াজিব। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে। **(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা-৩/৩৬৩, শরহে মাআ'নিল আছার-১/১২, আল্ বাহরুর রায়েক-২/৩৩২, আল্ লুবাব-৯০৩, মাখতুম-৪/৩৮)**

০৯. ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

মহিলাদের হজ্জ ও উমরার বিশেষ মাসায়েল

১. মহিলাদের কোন অবস্থায়ই মাহরাম ছাড়া হজ্জের সফর করা জায়েয হবে না। ইহা শক্ত কবীরা গুনাহ। যদি সাথে মাহরাম পাওয়া যায়, তাহলে সাথে নিয়ে যাবেন। নতুবা ঐ বৎসর হজ্জের সফর স্থগিত করে দিবেন। মাহরাম নিয়ে হজ্জে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবেন। যদি জীবদ্দশায় মাহরাম ব্যক্তি পাওয়া না যায়, অথবা কোন মারহামকে খরচ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ না হয়, তাহলে বদলী হজ্জের ওসিয়ত করে যাবেন। তার জন্য এ অছিয়ত করা যেমন ওয়াজিব তার সম্পদ থেকে ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত পালন করাও ওয়াজিব।

যেহেতু শরঈ মাহরাম ছাড়া ভিসা পাওয়া যায় না, তাই কোন কোন মহিলা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মাহরাম ছাড়া অন্য কাউকে মাহরাম বানিয়ে হজ্জ করতে যান।

পবিত্র হজ্জের সফরে এত বড় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া মারাত্মক গুনাহ। অন্যদিকে পুরো সফরে মাহরাম ছাড়া চলা ফেরা করার গুনাহ হতে থাকবে। যদিও মক্কা শরীফে থাকা নিজের আপন ছেলে, ভাই বা কোন মাহরাম মক্কা শরীফে সাথে থেকে হজ্জ করেন তারপরও মাহরাম ছাড়া সফর করার গুনাহ হবে। কাফেলার মুআল্লিম এবং ট্রাভেল এজেন্সি এমন গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার কারণে কবীরা গুনাহ হবে। তাই কোন অবস্থায় মাহরাম ছাড়া হজ্জে যাওয়া জায়েয হবে না। **এলাউসসুনান ১০/১০, আল্‌বাহরুর রাইক্ব ৩/৬০, মানাসিক পৃঃ ৫৫, গুনইয়াতুন্নাছেক পৃঃ ২৬**

২. সাধারণত মহিলাদের জন্য বর্তমানে হজ্জে তামাত্তু করাই শ্রেয়।

৩. মহিলাদের হজ্জ ও উমরার নিয়ম প্রায় পুরুষদের মতই। তবে মহিলাদের জন্য ইহরামের নির্দিষ্ট কোন পোষাক নেই। স্বাভাবিক যে কোন পোষাক, জুতা ও মৌজা এমনকি হাত মৌজাও পড়তে পারেন। সাদা পোষাক পড়া জরুরী নয়। তবে অলংকার ব্যবহার না করা চাই। **(গুনইয়াতুন্নাছেক পৃঃ ৯৪)**

৪. ইহরাম বাঁধার পূর্বে মহিলাগণ হায়েয (মাসিক) অবস্থায় হলেও গোসল করা সুন্নাত। তারপর (ঘ্রাণ ছড়ায় না এমন) সুগন্ধি ব্যহার করবেন ও চুল আচড়াবেন। হায়েয অবস্থান না থাকলে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দু'রাকাআত নফল নামায পড়ে নিবেন। অন্যথায় নামায ব্যতিত নিয়ত করবেন। (ইহরামের নিয়ত ও দু'আ সহ অন্যান্য বিষয় ইহরামের মূল আলোচনায় দেখে নিবেন।)

৫. ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারার হুকুম ঃ ইহরাম অবস্থায় মাথা ঢেকে রাখা ও মুখ খোলা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু বেগানা পুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া এবং পরপুরুষকে মুখ দেখানো হারাম। সুতরাং চেহারার সাথে না লাগে এমন কিছু কপালের উপর বেঁধে তার উপর কাপড়ের জালি দিতে হবে যাতে চলাচলে অসুবিধা না হয়। (মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ) যাতে মুখমন্ডলের সাথে কাপড় লাগা না থাকে, আবার মুখ খোলাও না থাকে। বর্তমানে ক্যাপ নেকাব দোকানে পাওয়া যায়। ফলে বাতাসের কারণে বা হাঁটা চলার সময় মাঝে মধ্যে চেহরার সাথে নেকাব লেগে গেলে অসুবিধা নেই। **(সুনানে আবি দাউদ ১/২৫৪, মানাসিক পৃ: ১১৫)**

এ ব্যাপারে মহিলাদের অত্যন্ত উদাসীন দেখা যায়। হজ্জের সফরেও যদি পর্দা না করি, যাদের সাথে দেখা দেয়া নাজায়িয, তাদের দেখা দেয়া, কথা-বাতা বলা বিশেষ করে এ সফরে কঠিন গুনাহ হবে। হজ্জের সফরে আমল বেশী করার চেয়ে গুনাহমুক্ত থাকা বেশী জরুরী। অনেকেই চেহারা খুলে রাখেন, আবার অনেকে মুখের সাথে লাগিয়ে রাখেন।

৬. মহিলাদের জন্য চুলে তেল দেয়া, সীথি করা যাবে না। সাজসজ্জার নিয়ত না থাকলে প্রয়োজনে চুল খোলা রাখা এবং অস্বস্তি বোধ করলে বা চুলের জট খুলতে চুল আচড়াতে পারবেন। মেহেদী লাগানো বা সাসজ্জার ক্রিম-পাউডার ঘ্রাণমুক্ত হলেও ব্যবহার করা যাবে না। **গুনইয়াতুন্নাছেক: ১১৫**

৭. মহিলারা তাওয়াফের সময় কখনও ইযতিবা ও রমল করবেন না এবং সাঈর সময় সবুজ বাতি দুটির মাঝে দৌড়াবেন না।

৮. এমনভাবে মাথা বেঁধে রাখবেন, যাতে একটি চুলও দেখা না যায়। এজন্য ওড়না ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু তা যেন কপালে না আসে। কপাল লম্বা সময় ঢাকা পড়লে দম পর্যন্ত ওয়াজিব হতে পারে।

৯. তালবিয়া, দু'আ, দরূদ ইত্যাদি চুপে চুপে পড়তে হবে।

১০. বেপর্দা চলা ফেরা বা পুরুষদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি, ধাক্কা ধাক্কি করে কোন ক্রমেই হজ্জ ও উমরার কোন আমল করা যাবে না। বরং যথাসম্ভব পুরুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আমল করবেন।

মহিলাদের জন্য

নফল তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া

মহিলাদের জন্য ভিড়ের মধ্যে নফল তাওয়াফ করা উচিত নয়। তাওয়াফ এবং অন্য যে কোন সময় পুরুষের ভিড়ে না ঢুকে কিনারে অথবা উপর তলায় আদায় করবেন। হযরত আয়েশা রা. পুরুষের ভিতর ঢুকে তাওয়াফ করতেন না। একবার তাওয়াফ করার সময় এক মহিলা তাঁকে বললেন, চলুন, আমরা ইসতিলাম করি, হযরত আয়েশা রা. অস্বীকৃতি জানিয়ে তাকে সরে যেতে বললেন। **(বুখারী)**

হযরত উমর রা. পুরুষদেরকে মহিলাদের সাথে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছিলেন, এরপর মহিলাদের সাথে তাওয়াফ করতে দেখে এক ব্যক্তিকে দোররা মেরেছিলেন। **(উমদাতুল ক্বারী)**

মহিলাদের তাওয়াফের জন্য রাত্রে যাওয়া উত্তম। মহিলা সাহাবিয়াগনের আমলও এমনই ছিল। **(ফতহুল বারী)**

১১. তাওয়াফ এমন সময় করবেন যাতে নামাযের জামাআ'তের আগেই তাওয়াফ শেষ হয়ে যায়। যাতে তাওয়াফ শেষ করে মহিলাদের নামাযের স্থানে অথবা ভিড় থাকলে নিজ কামরায় এসে নামায পড়তে পারেন।

১২. ভীড়ের সময়ে কা'বা শরীফের দূর দিয়ে তাওয়াফ করবেন, দূর থেকে হাতের ইশারায় হাজারে আসওয়াদে চুম্বন বা ইস্তিলাম করবেন।

ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি করে হাজরে আসওয়াদে চুম দেয়া পুরুষদের জন্যই নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য তো আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মনে রাখবেন গুনাহ মোচনের স্থানে যেন গুনাহ না হয়ে যায়।

(গুনইয়াতুন্নাছেক পৃঃ ৯৪)

মহিলাদের জন্য পর-পুরুষের স্পর্শে আসা নিষেধ বিধায় তারা যেন হজ্জের মৌসুমে ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী না হন, মাকামে ইবরাহীমের কাছাকাছি যেন নামায না পড়ে। **(ফাতওয়ায়ে শামী)**

হযরত আয়েশা রা. এর নিকট এক মহিলা এসে বললেন যে, আমি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করেছি এবং দু'তিন বার হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছি। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. বললেন,

আল্লাহ তোমাকে সাওয়াব দান না করুন, আল্লাহ তোমাকে সাওয়াব দান না করুন!! তুমি চুমু দেয়ার জন্য পুরুষদের ভিড়ে কেন ঢুকেছ? হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে তাকবীর বলে ঐ স্থান কেন অতিক্রম করলেনা? (বাইহাকী, মুসনাদে ইমাম শাফেঈ)

বাইহাকী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. মহিলাদেরকে বলতেন,

যদি তোমরা পুরুষ থেকে খালি পাও তবে ইছতিলাম করবে, তা না হলে তাকবীর বলে সরে যাবে।

হযরত আয়েশা রা. এক মহিলাকে বললেন,

হাজরে আসওয়াদে ভিড় করবে না, যদি খালি পাও তবে চুমু দিবে, ভিড় দেখলে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে তাকবীর বলে সরে যাবে, আর কাউকে কষ্ট দিবে না। (ফিকহুস সুন্নাহ)

১৩. মাকামে ইবরাহীমের কাছে ভীড় থাকলে তাওয়াফের দু'রাক্আত নামায সেখানে আদায় করবেন না। **মহিলাদের জন্য নামাযের নির্ধারিত স্থান যেখানে শুধু মহিলারা নামায আদায় করেন সেখানে নামায আদায় করবেন। সেখানেও জায়গা না পেলে ঘরে গিয়ে আদায় করবেন, তবু পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াবেন না।**
(গুনইয়াতুন্নাছেক পৃঃ ৯৪, মানাসিক পৃঃ ১১৫)

মহিলা ও পুরুষ একসাথে নামায পড়ার হুকুম

পুরুষ ও মহিলা যদি নামাযের জামাআ'তে একসাথে দাঁড়ান, মাঝখানে কোন অন্তরায় না থাকে, অথবা মহিলার পিছন বরাবর কোন পুরুষ দাঁড়ান, তখন কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে তিনজন পুরুষের নামায অর্থাৎ মহিলার ডানের একজন, বামের একজন, পিছনের একজনের নামায নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। চাই সে পুরুষ বাপ, ভাই, সন্তান বা স্বামী যেই হোক না কেন, এভাবে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নাজায়েয।

যদিও বর্তমানে হজ্জে প্রচন্ড ভিড়ের কারণে ফুকাহাগণ নামায ভঙ্গ না হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তবে একে তো মহিলা পুরুষ পাশাপাশি আবার ভিড়ের কারণে শরীরের সাথে শরীর লেগে যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ মাফ করেন, শয়তান যদি সুযোগ পেয়ে যায় এবং মনের ভিতরে কিছু এসে যায়, তখন এ নামাযের কি অবস্থা হবে? এটাই কি লক্ষগুণ ছওয়াব হাসীলের নামায হবে? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেদায়েত দান করুন। আমীন!

সুতরাং পুরুষেরা সাবধান, নিজেদের সঙ্গের মহিলাকে নিজের সাথে অথবা অন্য পুরুষদের সাথে নামাযে দাঁড় করাবেন না। মহিলারাও অন্যের নামায নষ্ট হওয়ার কারণ হবে না। আর হারাম শরীফে নামায পড়ে সাওয়াব কামাই করার চেয়ে গুনাহ কামাবে না। মহিলাদের নির্দিষ্ট স্থানে সম্ভব হলে নামায পড়বেন, অন্যথায় ঘরে নামায পড়বেন। বরং এই অবস্থায় ঘরে নামায পড়াই উচিত। অতএব, ঘরে নামায পড়লেও ইনশাআল্লাহ এক রক্ষ রাকাআতের ছাওয়াব পাবেন। বরং পুরুষদের সাথে একসাথে নামায না পড়ে ঘরে নামায পড়ার কারণে আরো অধিক সাওয়াব পাবেন।

> হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, এই যমানায় মহিলারা যা করছে যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিতেন।
>
> **বুখারী-১৬৩, মুয়াত্তা ইমাম মালেক-৪৬৮, আবু দাউদ-৫৬৯**

উম্মে হুমায়েদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে জামাআতে নামায পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমার ঘরে নামায আদায় করা তোমার জন্য উত্তম। **মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-২৭১৩৫, বাইহাকী-৫১৫৪, ইবনে হিব্বান-২২১৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৭২২১**

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি হযরত আয়েশা রা. সেই যুগে ভিড়ের কারণে মহিলাদের হারাম শরীফে নামায থেকে নিষেধ করে থাকেন, তাহলে বর্তমান সময়ে ফিতনার যামানায় প্রচন্ড ভিড়ে পুরুষদের সাথে একত্রে নামায পড়া কত কঠোর ভাবে নিষেধ হবে, তা সহজে অনুমান করার কথা। উপরন্তু দ্বিতীয় হাদীসে স্বয়ং হুজুরের পিছনে হারাম শরীফে এসে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে নামায পড়া উত্তম বলেছেন। অতএব, মহিলারা বিশেষ করে ভিড়ের সময় ঘরে নামায পড়লে অবশ্যই বেশী সওয়াব পাবেন। অবশ্যই হারাম শরীফে মহিলাদের জন্য ঘেরাও করা পৃথক স্থানে নামায আদায় করতে পারেন। তবে আসা যাওয়ার পথে ভিড়ে পুরুষদের পাশাপাশি হওয়া থেকে ঘরে একাকী পড়াই উত্তম।

মানাসিক পৃ: ১১৫, গুনইয়াতুন্নাছেক পৃ: ৯৪

১৪. ইহরাম বাঁধার সময় যদি হায়েয (মাসিক) অবস্থায় থাকেন তাহলে নিয়ত করার পর শুধুমাত্র তালবিয়া ও যিকর আযকার করবেন। তাওয়াফ, নামায, কুরআন তেলাওয়াত করবে না ও হারাম শরীফে প্রবেশ করবেন না। যে দিন পাক হবেন সেদিন উমরার বাকী কাজ সম্পাদন করবেন।

১৫. হজ্জ ও উমরার আমলগুলো নির্বিঘ্নে পালনের জন্য মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এমন ঔষধ সেবন করতে পারবেন। এমতাবস্থায় তাওয়াফ, নামায, রোযা সহ সবকিছু পালন করতে পারবেন।

১৬. যদি হজ্জের শুরুতে মিনা যাওয়ার সময় হায়েয অবস্থায় থাকেন, তাহলে গোসল বা অজু করে ইহরাম বেঁধে নিবেন। এভাবেই মহিলারা মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফায় অবস্থান করে হজ্জের সমস্ত কাজ শেষ করবেন। তালবিয়া পাঠ, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ইত্যাদি করবেন। কিন্তু পাক না হওয়া পর্যন্ত ফরয তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারবেন না।

পাক হওয়া পর্যন্ত ১২ যিলহাজ্জ পার হলেও অপেক্ষা করবেন। এর জন্য কোন দম ওয়াজিব হবে না। তবে সময় থাকা সত্ত্বেও যদি ১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত না করে থাকেন, তাহলে দম দিতে হবে। **(রদ্দুল মুহতার পৃ: ২/৫১৯)**

দেশে ফেরার পূর্বে এ অপারগতার সাথে (মাসিক অবস্থায়) অবশ্যই তাওয়াফে য়িয়ারত করে নিতে হবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে পূর্ণ একটি উট বা গরু হারাম সীমানার ভিতরে জরিমানা স্বরূপ জবাই করতে হবে। এর সাথে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ইস্তেগফারও করতে হবে।

তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে ফিরে গেলে আবার মক্কা শীফ এসে এ তাওয়াফ করতে হবে। যত দিন তাওয়াফ না করবেন ততদিন স্বামীর সাথে একত্রে থাকতে পারবেন না। (এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়।)
(রদ্দুল মুহতার পৃ: ২/৫১৮, ৫১৯, গুনইয়াতুন্নাসেক পৃ: ১৭৭, মাআরেফুস্‌সুনান পৃ: ৬/৩৫৭)

১৭. বিদায়ী তাওয়াফের বেলায় হায়েয অবস্থায় থাকলে পাক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, পবিত্র হওয়ার পূর্বেই যদি ফ্লাইটের সময় এসে যায় এবং ফ্লাইট পরিবর্তন করা সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। কোন দমও দিতে হবে না।

১৮. হায়েয অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা যাবে না, তাওয়াফ করাও যাবে না।

১৯. ইহরাম বাঁধার পর মীকাতে পৌঁছার আগেই হায়েয শুরু হলে মীকাতে পৌঁছে উযূ গোসল করে ইহ্‌রাম বেঁধে নিবেন। নামায, তাওয়াফ ও সাঈ ব্যতীত হজ্জ ও উমরার অন্যান্য কাজ করতে পারেন। মাসিক বন্ধ হলে গোসল করে নামায, তাওয়াফ ও সাঈ করবেন।

২০. তাওয়াফ শেষ করার পর যদি হায়েয শুরু হয় তবে সেই অবস্থায়ই সাঈ করা যাবে, কারণ সাঈর জন্য হায়েয থেকে পবিত্র থাকা জরুরী নয়। কিন্তু তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা জরুরী।

২১. হায়েয, নেফাছ অবস্থায় উকূফে আরাফাহ করা যাবে, তবে নামায আদায় করা যাবে না। কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া তাকবীর, তাহলীল,

তালবিয়া, যিক্‌র, আযকার, অন্যান্য দু'আ-দরূদ যথারীতি আদায় করবেন।

২২. সৌদী আরবের মুকীম মহিলারা হায়েযের কারণে তাওয়াফে যিয়ারত না করে ঘরে ফিরে যেতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় সীমানা (যেমন আয়েশা মসজিদ) থেকে ইহরাম বেঁধে এসে প্রথমে উমরা পালন করবেন, তারপর তাওয়াফে যিয়ারত করবেন এবং বিলম্বের জন্য দম দিবেন। মনে রাখতে হবে, তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের ফরয, ইহা ছাড়া হজ্জ হবে না।

২৩. যদি হায়েয তাওয়াফ অবস্থায় এসে যায়, তবে তাওয়াফ বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ মসজিদুল হারামের বাইরে যেতে হবে। তাওয়াফের পরে যে সাঈ করতে হত, তাও করা যাবে না। কারণ, তাওয়াফ ছাড়া সাঈ হয় না।

মহিলাদের জন্য পর্দা

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মহিলারা মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারায় এসে যেরূপ বেপর্দা, ও বে-পরওয়াভাবে চলাফেরা করেন, তা দেখলে শরীর ও মনে কম্পন সৃষ্টি হওয়ার কথা। পর্দা নারীদের জন্য সর্বস্থানেই ফরয এবং বেপর্দাভাবে চলা হারাম। মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববীতে নেক কাজের ছওয়াব যেমন অধিক, গুনাহর ব্যাপারেও হিসাব একই রকমের। বাদশার দরবারে যেমনিভাবে অনেকে পুরুস্কারের অধিকারী হন তেমনিভাবে সামান্য অপরাধে ফাঁসির আশংকাও অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই চলা-ফেরা, চাল-চলনে পর্দার প্রতি খুব খেয়াল রাখবেন। হারাম শরীফের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করে চলবেন। সুশোভিত রঙিন কারুকার্য খচিত বোরকা পরিধান করে বের হবেন না। পুরুষদের দৃষ্টিকাড়ে এমন পোষাক পরবেন না। পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও পর্দার জন্য চোখের দৃষ্টি নত রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **(সূরা আন নুর)**

মহিলাদের চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়' এমন বিভ্রান্তিমূলক কথায় কান দিয়ে হজ্জের পবিত্রতা নষ্ট করা কোনভাবেই কাম্য নয়।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একাকী চলতাম, তখন মুখ অনাবৃত রাখতাম। আর যখন অন্য কোন পুরুষ আসার আলামত দেখতাম, তখন মুখমন্ডল ঢেকে ফেলতাম। **(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, আহকামুল কুরআন-৩/৪৫৮, মাবছুত-১০/১৫২, রদ্দুল মুহতার-১/২৭২।)**

হজ্জে বদল

যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কিন্তু সামর্থ ও সময় পাওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করতে পারেননি এবং নিজে হজ্জ করার মত শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন কিংবা হজ্জ না করেই মৃত্যুবরণ করেন অথবা যে মহিলার সাথে মাহরাম পাওয়া না যায়, এমন পুরুষ ও মহিলার জন্য অন্য কাউকেও তার পক্ষ থেকে খরচাদি

দিয়ে হজ্জে পাঠানো বা মৃত্যুর পর তার সম্পদ থেকে হজ্জ করার অসিয়্যত করা জরুরী। ওয়ারিশদের জন্য এই অসিয়ত পালন করা ওয়াজিব। একে হজ্জে বদল বলে। তবে শরঈ ওযর ব্যতীত হজ্জ করতে দেরী করা কবীরা গুনাহ।

পরহেযগার, মুত্তাকী, আলেম যিনি নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেছেন এমন ব্যক্তি দ্বারা হজ্জে বদল করানো উত্তম। যিনি নিজের ফরয হজ্জ এখানো আদায় করেননি এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্জের পাঠানো মাকরূহ।

বদলী হজ্জের নিয়ত

বদলী হজ্জকারী যার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করছেন, উমরা ও হজ্জের নিয়ত তার পক্ষ থেকে করবেন। ইহরামের সময় এভাবে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করলেই হবে। তাওয়াফ, সাঈ সহ অন্যান্য আমলে প্রেরকের পক্ষ থেকে পৃথক নিয়ত না করলেও চলবে।

হজ্জে বদলে ইহরাম কোথা থেকে বাঁধবেন

বদল প্রেরণকারীর এলাকা বা মীকাত থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে। অনেক সৌদি প্রবাসী হজ্জ মৌসুমে দেশের কাহারো পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ আদায় করেন। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে বদলী হজ্জে প্রেরণকারীর এলাকা (মীকাত) থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী। তাই সৌদিতে অবস্থানরত কাউকে দিয়ে বদলী হজ্জ না করানো চাই।

বদলী হজ্জের ইহরাম

বদলী হজ্জে ইফরাদ হজ্জ করার ব্যাপারে অনেক উলামায়ে কেরামের মতামত দেন। এজন্য বদলী হজ্জের ব্যাপারে ইফরাদ হজ্জ করাই নিরাপদ তবে বর্মমানে ব্যবস্থাপনার বাধ্যবাধকতার দরুন যদি ইহরাম অনেক দীর্ঘ হয় যা হাজী সাহেবের জন্য অত্যন্ত কষ্টের কারণ হয়, তখন প্রেরণকারীর অনুমতি স্বাপেক্ষে বা ব্যাপকভাবে বলে দিলেও তামাত্তু বা ক্বিরান করা জায়েয আছে। **(লুবাব ৪৫৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১/৫০৮, রুদ্দুল মুহতার ২/৬১১)**

তবে তামাত্তু বা ক্বিরান হজ্জ করলে হজ্জের কুরবানী নিজ খরচে করতে হবে। অবশ্য যদি প্রেরণকারী সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানীর খরচ দিয়ে দেন তাহলে জায়েয হবে।

বদলী হজ্জের খরচ সংক্রান্ত মাসআলা

প্রেরণকারীর টাকা তার অনুমতি ব্যতিত খরচ করা যাবে না। এ জন্য হাজী সাহেবকে খরচের পূর্ণ এখতিয়ার দিয়ে এ কথা বলে দেয়া উত্তম যে, যা বেঁচে যাবে তা আপনার জন্য হাদিয়া। অনেকে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে খরচের ক্ষেত্রে অনুমতি হিসাবে বদলী হজ্জের জন্য দেয়া টাকা হাজী সাহেবকে মালিক বানিয়ে দেন। এটা ঠিক নয়। কারণ, তখন সে এ টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার কারণে বদলী হজ্জ আদায়কারীর এই হজ্জ তার নিজের মালিকানা টাকায় করা হচ্ছে। প্রেরণকারীর টাকায় প্রেরণকারীর জন্য বদলী হজ্জ করা হয় না।

হজ্জ পালনের নিয়মাবলী

হজ্জে কেরাম সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু ক্বিরান হজ্জে ইহরাম অবস্থায় অনেক দিন থাকতে হয়, অনেক নিয়ম-নিষেধ মেনে চলতে হয় বিধায় বর্তমানে উলামায়ে কিরাম হজ্জে তামাত্তু করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে যদি সাহস করে ক্বিরান হজ্জের নিয়ত করেন অথবা শেষ দিকে ফ্লাইট হয় তাহলে ক্বিরান হজ্জ করতে পারলে অত্যাধিক ফযিলত ও অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

হজ্জে তামাত্তু'

হজ্জে তামাত্তু' নিজ এলাকা থেকে শুধু উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। উমরার কাজ অর্থাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ শেষ করে হালাল হতে হয়। অতঃপর এই সফরে ৮ই যিলহাজ্জ মক্কা মুকাররমা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করতে হয়। হজ্জে তামাত্তু' শুধু বহিরাগতদের জন্য নির্ধারিত। মক্কা মুকাররমার কোন অধিবাসী যদি হজ্জে তামাত্তু' করেন, তার জন্য দম দেয়া ওয়াজিব হবে। তাদের জন্য শুধু হজ্জে ইফরাদ করতে হবে।

আমাদের দেশে যেহেতু অধিকাংশ হাজী সাহেবান তামাত্তু হজ্জ আদায় করেন এবং তামাত্তু পালনকারী প্রথম উমরা করতে হয়, তারপর হলক্ব করে হালাল হয়ে হজ্জের পূর্বে পূনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধতে হয়। এ জন্য প্রথমে উমরার বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

উমরাহ্ পালনের নিয়মাবলী

যিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ ব্যতীত বৎসরের যে কোন সময়ই উমরা করা যায়। উমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ায় সা'ঈ করা, মাথা মুন্ডানো বা চুল ছোট করে হালাল হওয়াকে উমরা বলে।

অন্য সময় উমরা করা

যারা অন্য মৌসুমে শুধু উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাবেন, তারা উপরে বর্ণিত নিয়মেই উমরা করবেন। যদি অন্য মৌসুমে বা হজ্জের সময় সরাসরি মদীনা শরীফ যান তবে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা মুকাররমা আসার সময় উক্ত নিয়মেই উমরা করে হালাল হয়ে যাবেন। যারা মক্কা শরীফ অবস্থানকালে চাই রমজান হোক বা হজ্জ ছাড়া অন্য মৌসুমে উমরার উদ্দেশ্যে সফর করেন, তেমনিভাবে হজের সফরে হজের উমরা থেকে হালাল হওয়ার পর পুনরায় উমরাহ্ করতে চান তারা মসজিদে আয়েশা বা হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে ইহরাম বেঁধে উক্ত নিয়মে উমরা সম্পন্ন করবেন।

হজ্জের মৌসুমে উমরাহ্ করার হুকুম

হজ্জের উমরা ছাড়া স্বাভাবিক উমরার ব্যাপারে দুটি মাসআলা ভালভাবে মনে রাখবেন।

১. অনেকেই বলে থাকেন, হজ্জের পূর্বে হজ্জের উমরা ব্যতিত অন্য কোন উমরা করা যায় না। তারা দলিল দেন যে, যেহেতু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সফরে দ্বিতীয় উমরা করেননি। এমন দলিল ঠিক নয়। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করেছেন। এ জন্য কি কেউ বলবেন যে, একবারের বেশী হজ্জ করা যায়েয নেই। তবে তামাত্তুকারীদের জন্য হজ্জের পরেই উমরা করা উত্তম এবং হজ্জের পূর্বে উমরার চেয়ে তাওয়াফের ছাওয়াব বেশী।

২. হজ্জের উমরা ব্যতিত উমরা করতে হলে 'মসজিদে আয়েশা, জিই'ররানা তথা যে কোন দিকে হারাম সীমানার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে। কারণ, উমরার ইহরাম বাঁধার মাসআলা হল- হারাম সীমানার ভিতর যারা অবস্থান করেন, তাদের জন্য হারাম সীমানার বাহিরে গিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। যদিও সে মসজিদে আয়েশায় না গিয়ে জি'ইররানা বা যে কোন দিক দিয়ে

হারাম সীমানা অতিক্রম করে ইহরাম বাঁধে তাহলেও শুদ্ধ হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা. কে মসজিদে আয়েশা এর স্থানে ইহরাম বাঁধার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

উমরার ফরয দুইটি

১. উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা।

২. তাওয়াফ করা

উমরার ওয়াজিব দুইটি

১. সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

২. সাঈ করার পর মাথার চুল মোড়ানো বা চুল ছোট করে ফেলা।

(বাদা-ই-উসসানায়ে'-৩/৪৯৭, ২/৪৮০)

উমরার প্রথম কাজ ইহরাম
ইহ্‌রামের ফরয দুইটি

১. নিয়ত করা।

২. তালবিয়া পাঠ করা

ইহ্‌রামের ওয়াজিব দুইটি

১. সেলাই ছাড়া কাপড় পরিধান করে মীকাত থেকে, অথবা মীকাত অতিক্রমের আগেই কোন স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা।

২. ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম তথা নিষিদ্ধ কাজ ও বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা।

ইহরামের উত্তম বিষয়াদি

১. ইহ্‌রামের পূর্বে শরীরের ময়লা দূর করা।

২. বগল ও নাভীর নীচের সব পশম পরিষ্কার করা।

৩. হাত ও পায়ের নখ কাটা।

৪. ইহ্‌রামের নিয়তে গোসল করা। শিশুদের এবং হায়েয নেফাছগ্রস্থ মহিলাদের জন্যও গোসল মুস্তাহাব।

৫. নতুন অথবা ধোয়া সাদা লুঙ্গি ও চাদর ব্যবহার করা।

৬. দু'ফিতাওয়ালা স্যান্ডেল পায়ে দেয়া।

৭. মুখে ইহ্‌রামের নিয়ত শব্দ করে বলা।

৮. ইহ্‌রামের নামাযের পর মুছাল্লায় বসে নিয়ত করা।

৯. মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধা।

ইহ্‌রাম কোথা থেকে বাঁধবেন

মীকাত (শরীয়ত কর্তৃক ইহ্‌রামের নির্ধারিত স্থান) পৌঁছার পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা জরুরী। বাংলাদেশ থেকে যারা সরাসরি মক্কা শরীফ যাবেন তাদের মীকাত হলো ক্বারনুল মানাযিল যা জিদ্দা পৌঁছার আধা ঘন্টা পূর্বে অতিক্রম করে। সরাসরি মক্কা শরীফ গমনকারীদের ইহ্‌রাম ছাড়া এ স্থান অতিক্রম করা জায়েয নেই। এখানে পৌঁছার পূর্বে যদিও প্লেনে ইহ্‌রাম বাঁধার কথা ঘোষনা হয়, তারপরও বিমানে উঠার পূর্বেই ইহ্‌রাম বেঁধে ফেলাই উচিৎ।

প্লেনে উঠার পূর্বে নিয়ত ছাড়া ইহ্‌রামের কাপড় পরে মীকাত পৌঁছার পর নিয়ত করেন তাও জায়েয।

আর যারা প্রথমে মদীনা শরীফ যাবেন, তাঁরা ইহ্‌রাম ব্যতিত জেদ্দা হয়ে মদীনা শরীফ পৌঁছবেন, মদীনা শরীফ থেকে ফেরার পথে যুল হুলায়ফা (বর্তমানে "বীরে আলী") পৌঁছে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছবেন। যদি ইফরাদ বা ক্বিরান পালনকারী হন তাহলে ঢাকা থেকে প্লেনে উঠার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

যারা হজ্জের পূর্বে প্রথমে মক্কা শরীফ এরপর মদীনা শরীফ হয়ে পূনরায় মক্কা শরীফ আসেন

যারা হজ্জের পূর্বে প্রথমে মক্কা শরীফ যান এরপর মদীনা শরীফ হয়ে হজ্জের পূর্বে মক্কা শরীফ ফিরে আসেন, তারা মদীনা থেকে আসার সময় শুধু উমরার ইহ্‌রাম কিংবা শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধা অর্থাৎ হজ্জে তামাত্তু' বা হজ্জে ইফরাদের নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধতে পারবেন। হজ্জে কিরানের নিয়ত করলে ইহ্‌রাম বাতিল করে তামাত্তু বা ইফরাদেন নিয়ত করবেন। আর জরিমানা হিসাবে আলাদা একটি দম ওয়াজিব হবে। **(গুনইয়াতুন নাসিক-২১৫)**

মাসআলার জটিলতার দরুন হজ্জের পূর্বে মক্কা শরীফ প্রবেশ করার পর পুনরায় মক্কা শরীফ থেকে বের না হওয়াই নিরাপদ, হয়ত সরাসরি মদীনা শরীফ হয়ে মক্কা শরীফ আসবে নতুবা মদীনা শরীফ হজ্জের পরে যাবেন। ট্রাভেলস এজেন্সীর সাথে এ ব্যাপারে জোড়ালো কথা বলে নিবেন।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

সুন্নাত নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে নখ, চুল, মোঁচ কেটে অন্যান্য চুল পরিষ্কার করে নিবেন এবং ইহরামের জন্য গোসল করবেন, সম্ভব না হলে মিসওয়াক করে শুধু ওযু করবেন। এরপর পুরুষগন সেলাই করা কাপড় খুলে এক পিস সাদা কাপড় লুঙ্গির মত (গিট্ট দেয়া ব্যতিত), আর একপিস চাদরের মত দু'কাঁধ ঢেকে গায়ে জড়িয়ে নিবেন এবং পায়ের উঁচু অংশ উম্মুক্ত থাকে এমন সেন্ডেল পড়বেন। মহিলাগন ঢিলে-ঢালা স্বাভাবিক কাপড় ও জুতা পরিধান করেই ইহরামের নিয়ত করবেন। এরপর পুরুষ শরীরে (কাপড়ে নয়) আতর লাগিয়ে নিবেন। ইহরামের কাপড়ে আতর না লাগানোই ভাল। **(মানাসিক পৃ: ১০২, রদ্দুল মুহতার ২/৪৮০, আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮১, আল-মাবসূত ৪/১২৩, মানাসিক ৩৫৬)**

মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে ইহরামের নিয়তে মাথা ঢেকে বা টুপি পড়ে দু'রাকাআত নফল নামায পড়ে নিবেন। প্রথম রাকাআতে ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পড়া উত্তম। মাকরূহ ওয়াক্ত বা অন্য কোন ওযরে এ দু'রাকাত পড়তে না পারলে কোন অসুবিধা নেই। এই দু'রাকাত ছাড়াও ইহরাম বাঁধা শুধ হবে। **(গুনইয়াতুন্নাসিক পৃ: ৭৩)**

- নামাযের পর মাথায় টুপি বা কাপড় সরিয়ে কাধে ও পিঠ ঢেকে নিয়ত করবেন।

উমরার ইহ্‌রামের নিয়ত

তামাত্তু পালনকারী উমরার ইহ্‌রামের নিয়্যত এভাবে করবেন-

اَللّٰهُمَّ ان اريد العمرة فيسرها لى وتقبلها منى

উচ্চারণ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী উরী-দুল উমরাতা ফাইয়াচ্ছিরহা লী-ওয়াতাকাব্বালহা মিন্নী-।

অর্থ

হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য উমরা পালনের নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

আর যদি ক্বিরান পালনকারী হন, তাহলে নিয়ত হবে- হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য উমরা ও হজ্জ একত্রে পালনের নিয়ত করছি। আপনি

তা সহজ করে দিন ও কবুল করে নিন।
ইফরাদকারী হলে নিয়ত- হে আল্লাহ। আমি আপনার সন'ষ্টির জন্য শুধু হজ্জ পালনের নিয়ত করছি। আপনি সহজ করে দিন ও কবুল করে নিন। যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয় (সূর্য উঠার সময়, সূর্য ঢলে পড়ার সময়, ফজরের পর ও আছরের পর) তাহলে ইহরামের নামায না পড়ে ইহরামের নিয়ত করবেন। নিয়ত করার পর পুরুষেরা শব্দ করে কমপক্ষে একবার তালবিয়া (তিন বার পড়া উত্তম) পড়ুন। একত্রে মিলে তালবিয়া পাঠ করা নিষেধ। মহিলারা নিরবে পড়বেন।

মাসআলা

তালবিয়া মুখে উচ্চারণ করে পড়া জরুরী।

তালবিয়া পাঠ করার পর এখন ইহরাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন থেকে ইহ্রামের নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরী। এখন থেকে এ তালবিয়াই আপনার জন্য সবচেয়ে বড় অযীফা। প্রতিটি মুহূর্তে যথা সম্ভব তালবিয়া (তিনবার করে) পাঠ করুন। এরপর সম্ভব হলে এ দু'আ পড়ুন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ-

উচ্চারণ

আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আসআলুকা রিয-কা ওয়ালজান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিন গদাবিকা ওয়ান্না-র।

এরপর দরূদ শরীফ পড়ে প্রাণ ভরে দু'আ করুন। এ সময় দু'আ খুব কবুল হয়। এভাবে নিয়্যত ও তালবিয়া পড়ার সাথে সাথেই ইহরামের বিধি-নিষেধ এর আওতাভুক্ত হলেন। ইহরাম বাঁধার পর অনর্থক কথা-বার্তা ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা চাই। হজ্জ ও উমরার সফরে আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অর্জন করতে না পারলে এত টাকা খরচ করে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে কি অর্জন করলাম? তাই ইহরাম বাঁধার পর খুব সতর্ক থাকতে হবে।

সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম নয়

মনে রাখতে হবে- দু'টি সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করার নাম ইহরাম নয় বরং সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করা ইহ্রামের একটি ওয়াজিব

মাত্র। মূলতঃ ইহরাম সম্পন্ন হয় দু'টি আমল দ্বারা-

১. হজ্জ বা উমরার নিয়ত করা ও

২. তালবিয়া পড়া।**(জামে তিরমিযী ১/১০২; মানাসিক ৮৯; গুনইয়াতুন নাসিক ৬৫)**

ইহ্‌রামের কাপড় পরিবর্তন করা

কেউ কেউ মনে করেন, যে কাপড়ে ইহরাম বাঁধা হয়েছে ইহরাম শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বদলানো যাবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। বরং সাধারণ পোষাকের ন্যায় ইহরামের কাপড় নাপাক না হলেও বদলানো যাবে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ১৫০১০-১১; মানাসিক ৯৮; গুনইয়াতুন নাসিক ৭১)

হজ্জ ও উমরার নিয়ত নির্দিষ্ট করে করতে হবে

ইহরাম বাঁধার সময় উমরা বা হজ্জের প্রকার নির্দিষ্ট করে নিয়্যত করতে হবে। ইহরামের সময় সতর্কতার সাথে নিয়্যত করবেন। তামাত্তু পালনকারী শুধুমাত্র উমরার নিয়ত করবেন। এরপর হজ্জের সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করবেন। ক্বিরান পালনকারী একত্রে উমরা ও হজ্জের নিয়্যত করবেন, ইফরাদ পালনকারী শুধুমাত্র হজ্জের নিয়্যত করবেন। অনেক সময় নিয়তের ভুলের কারণে দম পর্যন্ত ওয়াজিব হতে পারে। যেমন- তামাত্তু পালনকারী উমরার ইহরামের সময় যদি হজ্জের নিয়ত করে ফেলেন, তাহলে তা ইফরাদ হজ্জের নিয়ত হবে। এমতাবস্থায় হজ্জ শেষ করার পূর্বে ইহরাম খোলা যাবে না। মক্কা শরীফ পৌঁছে যদি উমরা পালন করে হালাল হয়ে যান, তাহলে ইহরাম অবস্থায় হালাল হওয়ার কারণে দম ওয়াজিব হবে। এমনকি এ অবস্থায় একাধিক দমও ওয়াজিব হতে পারে।

ইহরামের নিয়ত করার পর কিভাবে চলবেন

হজ্জের ফযিলত তো বয়ান করে শেষ করা যাবে না; তবে আর কোন ফযীলত যদি নাও থাকে, এতটুকু ফযীলতই তো যথেষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে, আর হজ্জের অবস্থায় কোন অশ্লীলতা ও অনাচার করেনি, সে হজ্জ থেকে ফিরে আসবে ঐ দিনের মত যেদিন তার মা তাকে জন্মাদান করেছে'।

"সুবহানাল্লাহ! আমাদের সামনে এখন সুযোগ এসেছে সারা যিন্দেগীর সমস্ত গোনাহ্ খাতা থেকে পাকছাফ হওয়ার। সুতরাং খুব হুঁশিয়ার থাকা চাই, নফস ও শযতানের ধোকায় যেন না পড়ে যাই এবং কোন প্রকার গোনাহ ও নাফরমানি যেন না হয়ে যায়। অশ্লীল ও ফাহেশা কথাবার্তা যেন না হয়, কারো সাথে কোন রকমের ঝগড়া-বিবাদ যেন না হয়। আপনি যদি হকের উপর থাকেন তবু ঝগড়া-বিবাদ না করা চাই। দিলের মধ্যে এ কথা সর্বদা ইয়াদ রাখা চাই যে, ইহরামের লেবাস তো কাফনের লেবাস, মুরদা মানুষের লেবাস। মুরদা মানুষ কিভাবে গুনাহ করতে পারে! মুরদা মানুষ কিভাবে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে পারে! মওতে মুরদা তো আমাদের হতেই হবে, তাহলে ইহরামের মুরদা আমরা কেন হতে পারবো না! তো আজ থেকে ইহরামের শেষ দিন পর্যন্ত আমরা মুরদা হয়ে গেলাম। আল্লাহ না করেন যদি কখনো ভুল হয়ে যায়, পরস্পরকে আমরা ইয়াদ করিয়ে দিবো যে, ভাই, আমরা তো এখন ইহরামের মুরদা ইনসান! সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করে নেবো। ভুল হয়ে যাওয়া বড় খাতরার বিষয় না, বড় খাতরার বিষয় হলো বুলের উপর গাফলাত। গাফলাত থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"
(বাইতুল্লাহর মুসাফির)

- যখন নির্দিষ্ট দিনে ফ্লাইটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন এমনভাবে রওয়ানা দিবেন যেন দুনিয়া থেকে আখেরাতের সফর শুরু করেছেন। দু'রাকাআত নামায পড়ে ভালভাবে দুআ করে সফরের দুআ' পড়ে রওয়ানা দিবেন। যদি প্রথমে মক্কা শরীফ সফর হয় তাহলে প্লেনে উঠার পুর্বেই ইহরাম বেঁধে নিবেন। সফরে নামাযের প্রতি খুব খেয়াল রাখবেন। কোন ভাবেই যেন নামায কাযা না হয়। প্লেনে নামায কসর (দু'রাকাআত) পড়তে হবে। প্লেনে সুগন্ধি টিস্যু, সাবান ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন। ইহরাম বাঁধার পর থেকে একাকী সামান্য উঁচু আওয়াযে তালবিয়া পড়তে থাকবেন। অনেককেই সম্মিলিত ভাবে এক সূরে তালবিয়া পাঠ করতে দেখা যায়। এটা নিষেধ।

ইহ্‌রাম অবস্থায়

নিষিদ্ধ কাজ

১. ইহরাম অবস্থায় সব ধরণের সৌন্দর্য ত্যাগ করা চাই। তাই সৌন্দর্যের নিয়তে শরীরে বা চুলে তেল, খেযাব ব্যবহার করা যাবে না।

২. পুরুষদের জন্য শরীরে অঙ্গের আকৃতি বা গঠন অনুযায়ী তৈরী করা পোশাক পরিধান করা নিষেধ। যেমনঃ পায়জামা, পাঞ্জাবী, জুব্বা, সার্ট, কোর্ট, গেঞ্জি, সোয়েটার, সেলোয়ার, পেন্ট, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি। ইহরামের নিচের কাপড় সেলাই বিহীন থাকা চাই। তবে প্রয়োজনে বিশেষ করে বৃদ্ধ হাজী সাহেবদের জন্য সেলাই করা লুঙ্গি পরিধান করা জায়েয আছে।

৩. পুরুষদের জন্য এহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢেকে রাখা নিষেধ। টুপি ও পরতে পারবে না। চাদর লেপ দিয়ে চেহারা ঢেকে শোয়া বা পূরা মুখমন্ডল বালিশে ঢেকে শুয়া নিষেধ। **(আদ্দুররুল মুখতার ৪/৪৮৭)**

৪. পুরুষেরা পায়ের পাতার মাঝখানের উঁচু অংশ ঢেকে যায় এমন জুতা পরা নিষেধ তাই দুই ফিতা বিশিষ্ট সেন্ডেল বা জুতা পরবেন। পুরুষেরা মৌজা পরতে পারবেন না। **(রদ্দুল মুহতার ২/৪৯০)**

৫. এহরাম অবস্থায় কাপড় বা শরীরে আতর, সুগন্ধি ব্যবহার করা ও ঘ্রান নেওয়া নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে সুগন্ধিযুক্ত তেল (নারিকেল, সরিয়া, তিল ও যয়তুনের তেল ইত্যাদি) সুগন্ধি সাবান, পাউডার ক্রীম, স্নো, পারফিউম যুক্ত যে কোন জিনিস ব্যবহার করা যাবে না।

৬. পান ছাড়া সুগন্ধি জর্দ্দা, শুধু লং এলাচী ইত্যাদি খাওয়া যাবে না। পানের সাথে সুগন্ধি জর্দ্দা বা পাকানো সুগন্ধি খাবার খাওয়া যাবে, তবে অনুত্তম। ইচ্ছাকৃতভাবে ফল-ফুলের ঘ্রাণ নেওয়াও মাকরূহ। **(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, মানাসিক ১২১)**

৭. ইহরাম অবস্থায় উকুন, বা শরীরের পোকা মাকড় মারা নিষিদ্ধ। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২২৪)**

৮. শরীরের কোন অংশের চুল-পশম উপড়ানো এবং হাত পায়ের নখ কাটা

নিষেধ।

৯. স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে উত্তেজনাকর আচরণ, আলিঙ্গন, চুম্বন বা উত্তেজনাকর কথাবার্তা নিষেধ। পাশাপাশি বসা, চলাফেলা করা, স্পর্শ করা নিষেধ নয়। তবে পাশাপাশি শোয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকা চাই।

১০. বন্য পশু পাখি শিকার করা বা শিকার করতে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। তবে ক্ষতিকারক জন্তু সাপ বিচ্ছু, পাগলা কুকুর ইত্যাদি হত্যা করা জায়েয।

ইহরাম অবস্থায়

যা নিষিদ্ধ নয়

১. এহরাম অবস্থায় চাদর, লেপ, কম্বল ইত্যাদি ব্যহার করা জায়েয। তবে মুখমন্ডল ঢাকা যাবে না। অবশ্য কান, ঘাড়, পা ঢাকলে কোন অসুবিধা নেই। (মানাসিক ১২৩)

২. সাবান বা সুগন্ধি কিছু ব্যবহার না করে গোসল করা যাবে। শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে।

৩. ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করা, ছিড়ে গেলে সেলাই করে পরিধান করতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৪৮১, মানাসিক ৯৮)

৪. প্রয়োজনে মাথা, দাড়ি আচড়ানো, চুলকানো জায়েয। তবে যদি চুল পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে যথাসম্ভব বিরত থাকা চাই।

৫. প্রয়োজনে ঘ্রাণমুক্ত ভ্যাসলিন, লিপজেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

৬. সেলাইযুক্ত বেল্ট, ব্যাগ, আংটি, ঘড়ি, চশমা এবং ছাতা ও ব্যবহার করা যাবে। (মানাসিক ১২২, আদ্দুররুল মুখতার ২/৯০)

য় পান খাওয়া। কাঁচা পিয়াজ বা কাঁচা রসুনের ছালাদ খাওয়া।

মাকরূহ বিষয়াদি

১. শরীর থেকে ময়লা দূর করা, মাথা, দাড়ি এবং শরীরে সাবান ব্যবহার করা।

২. চুল, দাড়ি চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো।

৩. চুল, দাড়ি এমনভাবে চুলকানো যাতে চুল, দাড়ি বা উকুন পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. উযু বা গোছলের সময় ছাড়া অন্য সময়ে দাড়ি খিলাল করা। উযু গোছলের সময়েও খুব সাবধানে আঙ্গুল চালাতে হবে যাতে দাড়ি পড়ে না যায়।

৫. ইহরামের লুঙ্গি ভাঁজ করে বা চাদর গিরা দিয়ে বাঁধা, সুঁচ অথবা পিন দিয়ে আটকানো অথবা রশি দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধা। অবশ্য বেশী মোটা হওয়ার কারণে যদি কোন কিছু দিয়ে ইহরামের লুঙ্গি বাঁধা ছাড়া উপায় না থাকে তাহলে বাঁধতে পারবেন।

৬. খোশবুদার ফল, ফুল ও ঘাস স্পর্শ করা।

৭. বিনা কারণে শরীরের কোথাও পট্টি বাঁধা।

৮. বালিশে মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া।

৯. রান্না করা নয় এমন খোশবুদার খাবার খাওয়া। এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি বা গোলাপ পানি দিয়ে পান করা। কাঁচা পিয়াজ বা কাঁচা ছালাদ খাওয়া।

শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ইহরাম

অবুঝ শিশু ও পাগল বা এ্যাবনরমালদের ইহরাম তাদের অভিভাবকগণ বেঁধে দিবেন। তাদের জন্য নিয়ত করে নিজেই তালবিয়া পাঠ করে নিবেন। এভাবে তাওয়াফ, সাঈ, রমী, মীনা, মুযদালিফা, আরাফায় অবস্থানের ব্যাপারে তাদের জন্য পৃথক নিয়ত করবেন এবং প্রয়োজনে তাদের কোলে করে আমলগুলো আদায় করবেন। বিবেক সম্পন্ন বুদ্ধিমান শিশুরা নিজেরা নিজেদের ইহরাম বাঁধবেন। হজ্জের যে সকল আহকাম নিজেরা পালন করতে পারবে, তা নিজেরাই করতে হবে। এমন বালকদের জন্য সেলাইহীন কাপড় দিয়ে ইহরাম বাঁধতে হবে। তবে দম বা সদকা ওয়াজিব হওয়ার মত কোন কাজ করলে তাদের উপর দম বা সদকা ওয়াজিব হবে না।

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

ঘর থেকে রওয়ানা হওয়া : পূর্বের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সফরের নির্দিষ্ট দিনে ঘরের সকলকে নিয়ে ভাল ভাবে দুআ' করে রওয়ানা দিন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়ুন।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ

বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি।

সম্ভব হলে এ দু'আ পড়ুন-

اَسْتَوْدِعُكُمْ اللهَ الَّذِىْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعَهُ.

অর্থ

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফাযতে রাখছি, যাঁর কাছে রাখা আমানত নষ্ট হয় না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ-

এরপর সম্ভব হলে আরবীতে না পারলে অন্তত বাংলায় এ দু'আ করুন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى

اَللّٰهُمَّ مَا تَرْضٰـــى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِىْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

অর্থ

হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আপনার কাছে নেকী ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি। আর এমন সব আমলের প্রাথ্না করছি, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ! আল্লামাদের সফরকে আপনি সহজ করে দিন এবং এর দূরত্বকে সংকুচিত করে দিন। হে আল্লাহ! এই সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং পরিবার পরিজনের মাঝে আপনি একমাত্র কর্মবিধায়ক। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট ও মন্দ অবস্থা থেকে এবং ফিরে আসার পর সম্পদ ও পরিবার পরিজনের অনিষ্ট থেকে।

যান বাহনে আরোহনের সময় এই দু'আ পড়বেন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা- ওয়ামা-কুন্না- লাহু মুকরিনীন। ওয়াইন্না-ইলা-রাব্বিনা-লামুনক্বালিবু-ন।

প্লেন ছাড়ার সময় এই দু'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

বিসমিল্লা-হি মাজরে-হা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রাব্বী-লাগাফু-রুর রাহী-ম।

রওয়ানা দিতে ও
বিমান বন্দরে করনীয়

আশকোনা হজ্জ ক্যাম্প

বিমান ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কমপক্ষে ৭/৮ ঘন্টা পূর্বে হজ্জ ক্যাম্পে ও ইয়ার পোর্টে পৌঁছা জরুরী। বিশেষ করে সরকারী হাজী সাহেবগণ। নতুবা অনেক সময় সমস্যা হয়। তবে বর্তমানে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হাজী সাহেবদের হাজী ক্যাম্পে যেতে হয় না। সরাসরি ইয়ার পোর্টে যেতে হয়। হজ্জ ক্যাম্পে সামানা ও টাকা-পয়সার প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি প্রথমে মক্কা শরীফ যাওয়া হয়, তাহলে হজ্জ ক্যাম্পে পৌঁছে ওযু-এস্তেঞ্জা, খানা ইত্যাদি সেরে ইহরাম বেঁধে নেয়া চাই। আর যদি প্রথমে মদীনা শরীফ যান তাহলে এখানে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। ইহরামের কাপড় বাঁধার নিয়ম অবশ্যই ভালভাবে জেনে নিবেন। যাতে সতর দেখা না যায় এবং বারবার খুলে না যায়।

প্লেনে উঠার পূর্বে ইহরামের নিয়ত না করলে

অনেকে ভুলে ইহরামের কাপড় বড় ব্যাগে দিয়ে দেন, যার কারণে মীকাত অতিক্রম করার সময় প্লেনেও ইহরাম বাঁধতে পারেন না। এমতাবস্থায় পরিচিত কারো থেকে নিয়ে হলেও প্লেনে ইহরাম বেঁধে নিবেন। তা সম্ভব না হলে শুধু ইহরামের নিয়ত করে নিবেন। এরপর জিদ্দায় পৌঁছে সাথে সাথে কাপড় কিনে দ্রুত ইহরাম বেঁধে নিবেন। এমতাবস্থায় দম ওয়াজিব হয়েছে কি না বিজ্ঞ আলেমের সাথে আলোচনা করে জেনে নিবেন।

- বিমান বন্দরে ঘোষণা হলে বিমানে উঠে বসে পড়ুন। সর্বাবস্থায় বেশী বেশী তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন।
- এরপর বড় ল্যাগেজ প্লেনের বেল্টে দিয়ে দিবেন। প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন: গামছা/তোয়ালে, রুমাল, প্রয়োজনীয় ঔষধ, ছোট বই, আমলের ওযীফা ইত্যাসিহ শুধু হাতের ছোট ব্যাগে রাখবেন।
- কোন অবস্থায় কাঁচি, নেলকাটার ইত্যাদি লোহার জিনিস হাতের ব্যাগে নিবেন না। প্লেনে এসব জিনিস সাথে নেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

প্লেনে
নামায পড়ার হুকুম

প্লেনে আরোহন কালে ওযুর পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকলে ওযু করতে হবে। তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। অবশ্য হজ্জের সময় যদি প্লেনে পানির সমস্যা হয়, তখন তায়াম্মুম করে নিবেন। প্লেনে নামায পড়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক ভুল করে থাকেন। সিটে বসেই নামায পড়ে ফেলেন ও সামনের সীটের পিছনে হাত রেখে রুকু সেজদা করেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এ মাসআলাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া উচিৎ।

যতক্ষণ পর্যন্ত দাড়ানো সম্ভব হয় দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয। তাই প্লেনে বা গাড়ীতে নিয়ন্ত্রণ ঠিক রেখে দাঁড়াতে পারলে বা প্লেনে নামায পড়ার আলাদা জায়গা করা থাকলে; যেমন সৌদি এয়ার লাইন্সের প্রায় প্লাইটে থাকে। এমতাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয হবে না। যদি কর্তৃপক্ষ বাধা প্রদান না করেন এবং যারা বৃদ্ধ নন তাদের জন্য প্লেনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া স্বাভাবিক ভাবে কঠিন নয়। যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়া না যায়, তাহলে সিটে তাশাহহুদের মত বসে সিটের উপর রুকু ও সিজদা করে নামায আদায় করবেন। যদি কিবলা ঠিক রাখতে বা অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে সিটের উপর সিজদা করা না যায়, তাহলে রুকু সিজদা ইশারার মাধ্যমে মাথা ঝুঁকিয়ে আদায় করবেন। রুকু থেকে সিজদায় মাথা একটু বেশী ঝুকাবেন। কিন্তু নিতম্ব যেন পা থেকে পৃথক না হয়। যমীনে সিজদা করা সম্ভব না হলে অর্থাৎ পা বরাবর স্থানে সিজদা করা সম্ভব না হলে মাথা সামনের দিকে হাঁটু বরাবর ঝুঁকিয়ে সিজদা করার মাধ্যমে নামায পড়বেন। সামনের সিটের পেছনে হাত রেখে হাতের উপর সিজদা করবেন না।

জিদ্দা বিমান বন্দরে করণীয়

- **জিদ্দা বিমান বন্দর নজর পড়লে এই দুআ' পড়বেন-**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا .

উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আসআলুকা খায়রা হা-যিহিল ক্বারইয়াতি ওয়া খায়রা মা-ফী-হা ওয়াআউ-যুবিকা শাররাহা-ওয়াশাররা মা-ফী-হা।

- **জিদ্দায় অবতরণের পর এই দুআ' পড়বেন-**

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا-

উচ্চারণ

রব্বি আদখিলনী-মুদখলা ছিদক্বিন ওয়া আখরিজনি-মুখরজা ছিদক্বিন ওয়াজআ'ল্লী-মিল্লাদুংকা সুলত্ব-নাননাসী-রা।

বিমান থেকে নেমে তালবিয়া পাঠ করতে করতে ইমিগ্রেশনের জন্য অপেক্ষা করুন। চেকআপের কাজ শেষ হলে নিজ নিজ সামানা নিয়ে হজ্জ টার্মিনালে বাসের জন্য অপেক্ষা করুন। এ সকল স্থানে সময় লাগতে পারে। বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন। খাবারের ব্যবস্থা হলে খাবার খেয়ে নিন। হজ্জ টার্মিনালে বা বাসে মুয়াল্লিমের লোক পাসপোর্ট নিয়ে যাবে। যা হজ্জ থেকে ফেরার পথে সময়মতো পেয়ে যাবেন। তবে পাসপোর্ট দেয়ার সময় অবশ্যই প্লেনের টিকেট রেখে দিবেন। প্লেনের

টিকেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হারিয়ে গেলে বড় সমস্যায় পড়তে হবে।

বি.দ্র. : পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসাকপিসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র ফটোকপি করে বা মোবাইলে ছবি তোলে রাখবেন।

এই দোয়াটি মক্কা নগরী দৃষ্টিগোচর হলে

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ بِهَا قَرَارًا وَارْزُقْنِىْ رِزْقًا حَلاَلًا

উমরার তাওয়াফ এর প্রস্তুতি

মক্কা শরীফে পৌঁছে নিজ থাকার স্থান ঠিক করে সামানাপত্র রেখে হারাম শরীফের দিকে রওয়ানা হবেন। শরীর দূর্বল থাকলে কিছু সময় আরাম করে তারপর তাওয়াফ ইত্যাদি করবেন। এর মাঝে শুধু নামাযগুলো জামাআতের সাথে আদায় করবেন।

বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ সম্ভব হলে প্রবেশ করবেন। অন্যথায় যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। হারাম শরীফে প্রবেশের সময় সুননাতের প্রতি খেয়াল রাখবেন। দৈনিক যতবার হারাম শরীফে প্রবেশ করবেন ততবার মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলো খেয়াল করে আদায় করবেন।

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত পাঁচটি

০১. বিসমিল্লাহ্ বলা

০২. দুরূদ শরীফ পড়া

০৩. দুআ' পড়া এভাবে-

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم

افتح لى ابواب رحمتك

০৪. ডান পা আগে দেয়া।

০৫. ইতিকাফের নিয়ত করা।

মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাত পাঁচটি

০১. বিসমিল্লাহ বলা

০২. দরূদ শরীফ পড়া

০৩. দু'আ পড়া

بسم الله والصلوة والسلام على رسول ا لله اللهم انى اسئلك من فضلك .

০৪. বাম পা আগে দেয়া

০৫. ডান পায়ে জুতা পরা ।

হারাম শরীফে প্রবেশের সময় এই দুআ' পড়বেন

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اَمْنُكَ وَحَرَمُكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَعَظْمِىْ وَبَشَّرِىْ عَلَى النَّارَ-

উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা হাযা আমনুকা ওয়ামাং দাখালাহু কানা আ-মিনা ফাহাররিম লাহমী ওয়াদামী ওয়াআযমী ওয়অ বাশারী আলান্নার ।

স্বপ্নের ভূমি

"জিদ্দা থেকে বাস রওয়ানা হলো, কোন দিকে? মক্কাভূমির দিকে, আল্লাহর ঘর যেদিকে, যে ঘর যিয়ারতের স্বপ্ন দেখেছি আজীবন, সে ঘরের দিকে। দূর থকে দেখা গেলো অসংখ্য বাতি এবং তার ঝলমল আলো। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের প্রিয় জন্মভূমি এ মক্কা ভূমি। সত্যি সত্যি আমি তাহলে দেখতে পেলাম এ পবিত্র ভূমি। এ সৌভাগ্য তাহলে লেখা ছিলো আমার ভাগ্যে ! হে আল্লাহ ! তোমার শোকর !

দূর থেকে হারামের আলোকিত মিনারগুলো দেখতে পেলাম। আবার ধ্বনিত হলো, লাব্বইক ... (তোমার দুয়ারে আমি হাযির হে আল্লাহ! তোমার বান্দা হাযির।)

হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর শহর! হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর শহর এব আমাদে পেয়ারা হাবীব (সা.) এর শহর। এ শহবেই তিন জন্মগ্রহণ করেচেন। এখানেই কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর! এখানেই তিনি যৌবনের পবিত্রতা দিয়ে মুগ্ধ করেছেন এমনকি শত্রুদেরও হৃদয়! সেই শহর, আমার সারা জীবনের স্বপ্নের মক্কা শহর। এত দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন এত সহজে সত্য হয়ে যায়! তোমার শোকর হে আল্লাহ! তোমার শোকর। **(বাইতুল্লাহর মুসাফির)**

বাইতুল্লাহ শরীফের
প্রথম দর্শণ, প্রথম দৃষ্টি

বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়ার মুহূর্তে সাথে সাথে যে দু'আ করা হয় উলামাগণ বলেন যে, তা কবুল হয়। এজন্য উত্তম দু'আ হল যে,

'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এ সফরের সমস্ত দু'আ গুলো কবুল করুন।'

আমাদের মুসতাজাবুদ্দাওয়াত বানিয়ে দিন (যাদের যে কোন দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়)।

তারপর এক পাশে হয়ে তিনবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দরূদ শরীফ পড়ে কান্নাকাটির সাথে খুব দু'আ করবেন। এখন দু'আ কবুলের সময় হতে পারে অনেকের জন্য ইহা প্রথম ও শেষ হজ্জ। দু'আ কবুলের এমন সুযোগ আবার নাও আসতে পারে।

বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও সওয়াবের কাজ। তাই মক্কা শরীফের অবস্থানকালীন মুহাব্বতের সাথে গুনাহ মাফের আশায় আবেদনপূর্ণ দৃষ্টিতে বেশী বেশী তাকিয়ে থাকুন। **(মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং ১৪৯৮৪)**

এখন থেকে তালবিয়া বন্ধ

উমরার ইহরাম বাঁধার পর তাওয়াফের জন্য হারাম শরীফ দৃষ্টি গোচর হওয়ার পর এবং তাওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়া পড়া বন্ধ করতে হবে। তখন থেকে আর কোন তালবিয়া নেই।

হারাম শরীফে হাজিরী

মক্কা মুকাররামা ও বিশেষ করে হারাম শরীফে আসতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। এত বড় সৌভাগ্য নিজের কোন যোগ্যতায় নয়, রাব্বে কারিমের শুধু দয়ায়। মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ সাহেব

হাফি. এ বিষয়টি তাঁর লিখিত কিতাব "বায়তুল্লাহর মুসাফির" গ্রন্থে কতইনা আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

'অবশেষে আমার জীবনে এলো শৈশব থেকে হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের কলি পূর্ণ প্রস্ফুটিত হওয়ার পবিত্রতম মূহুর্ত। ধীর পদক্ষেপে আমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম এবং দৃষ্টি অবনত রেখে দুরু দুরু বুকে অগ্রসর হলাম। আমার চারপাশে যেন নূরের সাগরে ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি। সময়ের সব কিছু যেন হারিয়ে গেলো। চারপাশের উঁচু উঁচু ভবন, এমনকি হারামের সুরম্য ইমারত সব হারিয়ে গেলো। আধুনিক সবকিছু মুছে গেলো। নূরের বন্যায় সময়ের সব চিহ্ন ভেসে গেলো এবং আমি ডুবে গেলাম।

এখন আমি চোখ মেলে তাকাবো। এখন আমার স্বপ্ন দেখার ব্যথা ও বেদনার উপশম হবে। এখন হৃদয়ে আমার স্বপ্নের পূর্ণতার শান্তি ও প্রশান্তি অর্জিত হবে। এখন আমি দেখতে পাবো আমার আল্লাহর ঘর। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি। কত রাত জেগে পশ্চিমের আকাশে তাকিয়েছি! বিলগিত হৃদয় থেকে কত অশ্রু ঝরিয়েছি। সফরে সফরে কত পথ পাড়ি দিয়েছি। কতদূর থেকে ব্যাকুলতা নিয়ে এসেছি আল্লাহর ঘর দেখবো বলে। হে আল্লাহ! সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতা সত্ত্বেও তুমি আমাকে তোমার পাক হারামে তোমার পবিত্র ঘরের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছো, আমি তোমার ঘর দেখবো। আল্লাহর ঘরের দীদার লাভের সময় পড়তে হয়-

اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ عِزًّا وَشَرَفًا.

(হে আল্লাহ তোমার ঘরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করো)

ধীরে ধীরে দুরু দুরু বুকে চোখ তুলে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম! আমার আল্লাহর ঘর আমি দেখতে পেলাম! কালো গিলাফে এবং নূরের পর্দায় ঢাকা বাইতুল্লাহ্ আমি দেখতে পেলাম! সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য যেন কেন্দ্রীভূত হলো কা'বাতুল্লাহর মাঝে। আমি যেন সৃষ্টিজগতের সমগ্র সৌন্দর্য অবলোকন করলাম, সমগ্র সৌন্দর্যে আমি যেন অবগাহন করলাম।

সময়ের প্রাচীর ভেঙ্গে শত শত শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম সেই সুদূর অতীতে, সেই নূর ও নূরানিয়াতের যুগে। আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নূর ও নূরানিয়াতের যুগে! আমি যেন দেখতে পেলাম সেই নূরানী কাফেলাকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ

করতে! আমিও শামিল হলাম সেই কাফেলায়। আমি ধন্য হলাম। আমার জীবন ধন্য হলো। আমার অস্তিত্ব সার্থক হলো। হে আল্লাহ, কীভাবে, কোন ভাষায় তোমার শোকর আদায় করবো! কী করে, কোন উপায়ে তোমার সমীপে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবো! হে আল্লাহ! আমার তো সাধ্য নেই তোমার প্রশংসা করার। তুমি নিজে তোমার যে প্রশংসা করেছো সেই তো তোমার যোগ্য প্রশংসা।

এই যে হাজারে আসওয়াদ!

হস্ত প্রসারিত করলেই যেন স্পর্শ পাবো। কিন্তু হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের যে কষ্ট হবে! আমি তো চাই শুধু তোমার সন্তুষ্টি! হে আল্লাহ! আমার অন্তরের আকুতি ও হৃদয়ের ব্যাকুলতা তুমি জানো। তোমার হাবীব যে প্রস্তর স্পর্শ করেছেন, তোমার হাবীব যে প্রস্তরে চুম্বন করেছেন তার একটু স্পর্শের জন্য একটি চুম্বনের জন্য আমি প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি, কিন্তু তোমার সন্তুষ্টির জন্য হে আল্লাহ, আমি বিসর্জন দিলাম আমার হৃদয়ের লালিত আকাঙ্ক্ষা।

আল্লাহু আকবার বলে দূর থেকে শুধু হাতের ইশারায় সম্মান জানালাম নবীজীর চুম্বনধন্য হাজারে আসওয়াদকে।

এই যে আল্লাহর ঘরের দুয়ার!

এই যে বাইতুল্লাহর মুলতাযাম! আল্লাহ সুযোগ করে দিলেন। ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হলাম এবং দু'হাত উঁচিয়ে দুয়ারের চৌকাঠ ধরলাম। মুলতাযামে বুক লাগামাল। আহ, কী শান্তি! কী প্রশান্তি! আবার যেন সময়ের ব্যবধান মুছে গেলো। শতাব্দীর প্রাচীর আবার যেন ভেঙ্গে গেলো। মুলতাযামের স্পর্শে আমি যেন সেই পবিত্র স্পর্শের পরশ অনুভব করলাম। আমার সর্বসত্তা যেন নূরানিয়াতে পূর্ণ হলো। আবার আমি ভেসে গেলাম নূরের বন্যায়।

হে আল্লাহ!

তোমার ঘরের মুলতাযামে দাঁড়িয়ে জানি না, আমি কি বলবো এবং কীভাবে বলবো! কি আমি চাইবো এবং কীভাবে চাইবো! তুমিই শিখিয়ে দাও। হে আল্লাহ! দয়া করে খুলে দাও, তোমার ফকীর বান্দার জন্য তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দাও।

এই যে মাকামে ইবরাহীম!

ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হলাম। চোখ দু'টোকে ধন্য করে দেখলাম, আল্লাহর খলীলের পাক কদমের ছাপ দেখলাম। এ পাক কদমের ছাপ আল্লাহর পেয়ারা হাবীব দেখেছেন, আমি জানি, এ দেখা সেই

দেখা নয়, তবুও তো দেখা! দৃশ্য নেই, সার্দশ্য তো আছে! من تشبه بقوم فهو منهم (যে যার সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত) এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে! সাদৃশ্যেরও মূল্য আছে। দৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য যদি অর্জন করতে পারো তাহলে তুমিও জামাআতে শামিল হতে পারো।

আল্লাহর পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াক শেষ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকটে দু'রাকাআত নামায পড়েছেন। এ দু'রাআকাত উম্মতের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে, কেন? আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণের জন্যই তো! মাগফেরাতের জ্ঞানে অন্তর্জ্ঞানী আল্লাহর কোন এক বান্দা তো বহু যুগ পূর্বে কিছু না কিছু অবলোকন করে এবং কিছু না কিছু উপলব্ধি করে বলে গেছেন-

رحمت حق بہانہ می جوید + رحمت حق بہانہ می جوید-

আল্লাহর রহমত আমলের বাহার দেখে না,
দেখে আমলের বাহানা।

আল্লাহর রহমত নেমে আসার পথে সেই 'বাহানাটুকু' পেশ করার নিয়তে চৌদ্দশ বছর পরের এক গোনাহগার উম্মতি, গোনাহের গান্দেগিতে ডুবে থাকা উম্মতি নামাযে দাঁড়ালো, গোনাহের সিয়াহি ও কালো দাগ বুকে নিয়ে, কালো গিলাফের নূরানিয়াত সামনে রেখে। হায়, আফসোস, অনুতাপে কলজে কি আমার ফেটে যাবে! কিংবা আমি কি পাগল হয়ে যাবো আনন্দের আতিশয্যে! সারা জীবনের নামায ছিলো এ ঘরের গায়েবানা।

আজ এই প্রথম নামাযে দাঁড়ালাম, এই প্রথম সিজদায় মাথা রাখলাম। নামাযে এত স্বাদ, এত শান্তি! সিজদায় এত স্বস্তি, এত প্রশান্তি! আবার আমার দৃষ্টি থেকে মুছে গেলো সময়ের সীমানা, বর্তমানের সব নিশানা। আমি দেখলাম অন্যরকম মানুষের অন্যরকম কাফেলা। এঁরা উম্মতের শ্রেষ্ঠতম কাফেলা। নূর! নূর!! চারদিকে শুধু নূর!!! নূরের সাগর! নূরের জোয়ার!! আমি যেন ভেসে গেলাম নূরের জোয়ারে! আমি যেন ডুবে গেলাম নূরের সাগরে!!

সালাম ফিরিয়ে চারদিকে যখন তাকালাম, দেখি, সবকিছু বর্তমান, সব কিছু বিদ্যমান। আধুনিক বিদ্যুতের আলোয় সবকিছু প্লাবিত। কিন্তু মনে হলো, অতীত যেন কিছু দিয়ে গেলো। আলোর উজ্জ্বলতায় নূরের পরশ যেন পাওয়া গেল। যুগে যুগে অতীত এভাবেই মনে হয় ফিরে ফিরে আসে বর্তমানকে নূরস্নাত হওয়ার জন্য।

যখন হাত তুললাম মুনাজাতের জন্য, বিগলিত হৃদয় থেকে কান্না উথলে উঠলো। চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এলো। এ কান্না আনন্দের! এ অশ্রু প্রশান্তির! সকল দাতার বড় দাতা যিনি, ভিখারীকে ডেকেছেন তিনি, কী জন্য! দান করার জন্যই তো! অনুগহে ও করুণায় সিক্ত করার জন্যই তো!

এবার আবে যমযম!

বিবি হাজেরার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার আবে যমযম! পিপাসায় কাতর শিশু ইসমাঈলের আবে যমযম! সর্বোপরি আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের পবিত্র থুথু মিশ্রিত আবে যমযম! দয়াময়ের দয়া তা থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলো না! আমার ঠোঁট দু'টা অপবিত্র বলে করুণাময়ের করুণা তা থেকে আমাকে দূরে রাখলো না। আমি সিঁড়ি বেয়ে নামলাম এবং কাছে গেলাম। আমি যমযমের কূপ দেখলাম এবং পান করলাম। যমযমের শীতল পানি প্রাণভরে পান করলাম এবং তৃপ্ত হলাম। আমি আরো পান করলাম এবং পরিতৃপ্ত হলাম। আমি আকণ্ঠ পান করে কোষে কোষে সুসিক্ত হলাম।

হে আল্লাহ! তোমার 'মুসাফির' মেহমান তোমার প্রতি খুশী হয়েছে। তার পিপাসা আজ দূর হয়েছে। হে আল্লাহ, তোমার হাবীব বলেছেন, যে মাকসাদে এবং যে উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করা হবে তুমি তা পূর্ণ করবে। হে আল্লাহ!

আবে যমযমের তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির পর আরো সৌভাগ্য আমাকে নিয়ে গেলো ছাফা-মারওয়ার মাঝে। আমার স্বপ্নের ছাফা ও মারওয়া আজ আমার চোখের সামনে! কীভাবে সম্ভব হলো তা? আমলের গুণে? যোগ্যতার বলে? না, আমার ইহরাম, আমার লাব্বাইক, এই তাওয়াফ, এই সাঈ শুধু আল্লাহর দান; 'জীবনে-মহাজীবনে' বান্দার যা কিছু প্রাপ্তি তা শুধু আল্লাহর মেহেরবানি।

ছাফা-মারওয়ার কেন এত বড় শান? এত বড় সম্মান? কারণ, ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর মুহাব্বতের নিশান। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا.

উচ্চারণ

ইন্নাছ ছাফা ওয়ালমারওয়াতা মিন শাআ'ইরিল্ল-হ। ফামান হাজ্জাল বাইতা আওই'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আঁই ইয়াততাওওয়াফা বিহিমা।

অর্থ

নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য, সুতরাং যে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ বা ওমরা করবে সে যেন ঐ দু'টির মাঝে সাঈ করে। সকল মর্যাদা ও মহিমা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যখন ইচ্ছা করেন পাথরের পাহাড়কেও এভাবে মর্যাদা দান করেন।

সময়ের প্রয়োজনে ছাফা ও মারওয়া যদিও কেটে কেটে সমান করা হয়েছে, তবু তা চার হাজার বছর আগের ছাফা-মারওয়া; এখানো দাঁড়িয়ে আছে মা হাজেরার পুণ্যস্মৃতি ধারণ করে। যত দিন আসমান আছে, যমীন আছে ততদিন থাকবে ছাফা-মারওয়া আল্লাহর ইশক ও মুহাব্বতের নিশান হয়ে।

যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্রোত চলছে ছাফা ও মারওয়ার মাঝে, যত দিন চাঁদ-সূর্যের উদয়াস্তের পরিক্রমা অব্যাহত থাকবে, ততদিন ছাফা-মারওয়ার এই জনস্রোত চলতেই থাকবে মা হাজেরার মমতা ও ব্যাকুলতাকে স্মরণ করে। সাফা-মারওয়ায় আশিকানের এই যে নূরানী জামাত, তাতে শামিল হবো বলেই তো আমি হাযির হয়েছি ইহরামের পাক-সফেদ লিবাস ধারণ করে! তাই আমি প্রস্তুত হলাম সাঈর আমল শুরু করার জন্য এবং তনু-মন একত্র করে ধীরে দীরে এগিয়ে গেলাম ছাফা পাহাড়ের দিকে।

এই ছাফা পাহাড়ে আল্লাহর ঘরকে সামনে রেখে আল্লাহর নবী একদিন দাঁড়িয়েছিলেন হকের আওয়াজ নিয়ে। এখান থেকেই সত্যের পথে ডেকেছিলেন তিনি মক্কার কোরায়েশকে। এখানে আবু জাহেল ছিলো, আবু লাহাব ছিলো, উতবা ছিলো, উমাইয়া ছিলো; ছিলো আরো অনেক দুর্ভাগা। তারা শুনেনি আল্লাহর নবীর দরদ-ভরা ডাক। বাতিলের শোরগোলে হকের আওয়াযকে তারা চাপা দিতে চেয়েছে। আল্লাহর নবীর তখনের ছাফা পাহাড় আজ আমার সামনে। সাফা পাহাড়ের সেই দরদী ডাকেরই তো ফসল আমি অধম উম্মতি! দুরু দুরু বুকে, বিগলিত হৃদয়ে আরোহণ করলাম ছাফা পাহাড়ে। এখান থেকেই শুরু হবে আমার সাঈ। কারণ আল্লাহর কালামে রয়েছে মারওয়ার আগে সাফা।

অনুসরণ ও আনুগত্যই হলো ইসলামের দাবী। আদমের পরিচয় সিজদা, ইবলিসের পরিচয় যুক্তি।

আমি দাঁড়ালাম সাফা পাহাড়ে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে। দেখতে পেলাম কালো গিলাফের সামান্য আভাস। তাতে হৃদয়ের গভীরে ভাবের ও আবেগের যে জোয়ার এলো তা সবকিছু যেন ভাষিয়ে নিয়ে গেলো। এখন দু'আ কবুলের মুহূর্ত, এখন তুমি যা চাবে তাই পাবে, কিন্তু কী চাইবো এখানে আমি আমার আল্লাহর কাছে! হৃদয়ে ভাবের জোয়ার আছে, কিন্তু মুখে নেই ভাষা। এখানে দাঁড়িয়ে সবাই কি হয়ে

পড়ে এমনই নির্বাক! হারিয়ে ফেলে ভাষা ও শব্দের অবলম্বন! সাঈ শুরু করার আগে এখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবী কী দু'আ করেছিলেন! মাওলার দরবারে উম্মতের জন্য কী চেয়েছিলেন! হে আল্লাহ, তোমার পেয়ারা হাবীবের সেই দু'আর, সেই চাওয়া ও পাওয়ার সামান্য কিছু অধম এ উম্মতিকেও দান করো; তোমার শান মোতাবেক দান করো।

মানুষ উঠছে আর নামছে খুব সাধারণ দৃশ্য কিন্তু কী অপূর্ব দৃশ্য। এখানে সবকিছু সাধারণ, তবু সবকিছু অসাধারণ আমার চারপাশে শুধু শুভ্রতা আর শুভ্রতা যত দৃষ্টি যায় যেন শুভ্রতার এক অন্তহীন স্রোত, এতদিন শুধু শুনেছি আর স্বপ্ন দেখেছি, আজ সৌভাগ্য হলো এ শুভ্রতা অবলোকন করার এবং এ শুভ্রতায় অবলোকন করার। তুমি হে আল্লাহ, তাওফীক দাও, জীবন-চলার পথে এ শুভ্রতাকে ধারণ করার।

ছাফা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলাম এবং চলতে শুরু করলাম যেন সময়ের প্রাচীর ভেঙ্গে অতীতের দিকে। একেক সময়ে একেক কাফেলার সঙ্গ লাভ করে করে আমি যেন পৌঁছে গেলাম সেই নূরানী কাফেলার পিছনে! সেখানে মাথার উপর ছাদ নেই, আছে নীল আকাশে মেঘের ছায়া; সেখানে পাখার বাতাস নেই, আছে রহমতের শীতলতা; সেখানে বিদ্যুতের ঝলমলতা নেই, আছে নূরের স্নিগ্ধতা। সেখানে আধুনিক যুগের কিছু নেই, কিন্তু আছে আসমানের সবকিছু। যখন কিছু থাকে না বন্ধু! তখনই সর্ব থাকে। যখন সব থাকে তখনই সবকিছু হারাতে থাকে। পাওয়ার ঘোরে হারানোর কথা একেবারেই ভুলে যায় মানুষ।

সাঈ চলতে থাকলো সাফা ও মারওয়ার মাঝে। বারবার সাফা থেকে নামলাম, বারবার মারওয়ায় উঠলাম। বারবার আমি দৌঁড়ে পার হলাম সবুজ আলোর সীমানা, মাতৃত্বকে, মায়ের মমতা ও ব্যাকুলতাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

সেদিন পাহাড়-ঘেরা এ নির্জন মরু-উপত্যকায় মা ও সন্তান ছাড়া কেউ ছিলো না, কিছু ছিলো না। সবুজ আলোর এই সীমানা তখন ছিলো এক ঢালুভূমি।

কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, এখন যেখানে যমযম সেখানে শুয়ে আছেন ফুলের মত সুন্দর ছোট্ট শিশু ইসমাঈল। পিপাসায় কাতর, কিন্তু পানি নেই এক ফোঁটা। কী করবেন মা হাজেরা! অস্থির হয়ে

একবার তিনি ছুটে যান সাফা পাহাড়ে, যদি দূরে কোথাও দেখা যায় কোন কাফেলার ছায়া! আবার গিয়ে উঠেন মারওয়ায়। আর ফিরে ফিরে দেখেন, পিপাসায় ছটফট করা কলিজার টুকরো তাঁর বেঁচে আছে কি না! ঢালুতে এসে কলিজার টুকরো তাঁর চোখের আড়াল হয়ে যায়, তাই তা দৌড়ে পার হন। এই হলো সবুজ সীমানার মাঝে দৌঁড়ের কাহিনী।

মারওয়ায় এসে সাঈ শেষ হলো, ফজরের আযানও শুরু হলো। হারামের মাঝে হারামের সুমধুর আযান ধ্বনি জীবনে এই প্রথম শোনা হলো।

আযান তো শুনেছি জীবনভর! আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! কিন্তু কী ছিলো হারামের আযান ধ্বনিতে! হয়ত সেই আযানের প্রতিধ্বনি! হে ভাই, তুমি যদি চিন্তা করো, তুমি যদি হৃদয়কে উম্মুক্ত করো তাহলে আজকের আযানের মাঝেও শুনতে পারো অতীতের নূরানী আযানের সুমধুর আসমানী সুর!

আলহামদু লিল্লাহ! তাওয়াফ ও সাঈর মাধ্যমে আমার ওমরা সম্পূর্ণ হলো। **এখন আমি ইহরাম থেকে মুক্ত হবো, তবে শুধু ইহরামের লিবাস থেকে, ইহরামের শিক্ষা থেকে নয়। ইহরাম তো ধারণ করাই হয় এর শিক্ষাকে সারা জীবন ধারণ করে রাখার জন্য।**

মারওয়ার পিছনে আল্লাহর বান্দারা দাঁড়িয়ে ছিলো ক্ষুর-কাঁচি হাতে। একজন জিজ্ঞাসা করলো, ছেঁটে দেবো, না কামিয়ে দেবো? বললাম, একেবারে কামিয়ে দাও। **জীবনের যা কিছু জঞ্জাল সব যেন সাফ হয়ে যায়। আজকেই এই পবিত্র মুহূর্ত থেকে জীবনের পথচলা আমি নতুন করে শুরু করতে চাই। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, নফসের গান্দেগি থেকে কলবের বান্দেগির দিকে।"** (বায়তুল্লাহর মুসাফির)

উমরার দ্বিতীয় ফরজ
তাওয়াফ

নিয়ত ও ইযতিবা: উমরার দ্বিতীয় কাজ হল, তাওয়াফ করা (ফরয)। তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তাওয়াফের নিয়ত করা শর্ত। পুরুষ হলে গায়ে জড়ানো কাপড়টি ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রেখে দিন। এটাকে 'ইযতিবা' বলে। সাত চক্কর শেষ হওয়া পর্যন্ত 'ইযতিবা' করবেন (সুন্নাত)। তাওয়াফ ছাড়া অন্য সময় ইযতিবা নাই। প্রথম তিন সক্করে রমল করবেন। নফল তাওয়াফ এবং যে তাওয়াফের পর সাঈ না থাকে সে তাওয়াফে ইযতিবা ও রমল করতে হবে না।

- শুরুতে রমল করতে ভুলে গেলে তিন চক্করের ভিতর যখনই মনে পড়ে রমল করবেন।
- মহিলাদের জন্য রমল ও ইযতিবা নাই।
- শুধু উমরা বা তামাত্তু পালনকারীগণ তাওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়া বন্ধ করে দিন। **(মানাসিকে মোল্লা আলী ক্বারী পৃ: ৪৬৪)**
- এরপর হাজরে আসওয়াদের কোনা বরাবর (যেখানে ফ্লোরে দোতলা বা তিন তলায় সবুজ চিহ্ন রয়েছে। ভালোভাবে লক্ষ করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন।) সেখানে হাজরে আসওয়াদকে ডান দিকে রেখে তাওয়াফের নিয়ত এভাবে করুন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

"আল্লাহ্ আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উমরার তাওয়াফ করছি। আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।"

তাওয়াফের
জরুরী কিছু মাসায়েল

তাওয়াফ অবস্থায় বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে তাকানো

তাওয়াফ অবস্থায় অনেক হাজী সাহেব ব্যাপকভাবে মারাত্মক এ ভুলটি করে থাকেন, আবেগে বার বার বাইতুল্লাহর দিকে তাকান। এই মাসআলাটি ভালোভাবে জানা উচিত।

বায়তুল্লাহ শরীফকে বাম দিকে রেখে তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফ চলাকালীন কা'বা শরীফের দিকে বুক বা পিঠ ফিরানো এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকানো মাকরূহ (তাহরীমী)। এ ব্যাপারে অনেকেই ভুল করে থাকেন। অতএব, আদবের সাথে দৃষ্টি সংযত রেখে মনে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভীতির সাথে তাওয়াফ করুন।

তাওয়াফকালীন হাজরে আসওয়াদ বরাবর এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার সময় বাইতুল্লাহর দিকে সীনা ফিরানো যাবে।

এ দুই স্থান ছাড়া যদি তাওয়াফের মধ্যে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে সীনা ফিরিয়ে কিছু মুহূর্ত তাওয়াফ করে থাকে, তাহলে পিছনে এসে ততটুকু তাওয়াফ পুনরায় করতে হবে।

হজ্জের মৌসুমে ভীড়ের কারণে পিছনে আসা সম্ভব নয় বিধায় অতিরিক্ত এক চক্কর করে নিবে। অনেকেই হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও বাইতুল্লাহর যে কোন স্থানে সুযোগ পেলে দেয়ালে চুমু দেন বা স্পর্শ করেন। ফলে সীনা বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে যায়। আবার অনেকে দলবদ্ধ ভাবে চলতে গিয়ে ভিড়ের কারণে বায়তুল্লাহর দিকে সীনা ঘুরে যায়। আর এভাবেই কিছুদূর তাওয়াফ চলতে থাকে। এতে ঐ অংশের তাওয়াফ সহীহ হয় না। **(সহীহ মুসলিম ১/৪০০, গুনইয়াতুন্নাসিক ১১৩, মানাসিক ১৫৩, রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৪)**

বাইতুল্লাহর যে কোন স্থানে স্পর্শ, চুম্বন ও আলিঙ্গন করা

অনেককেই বাইতুল্লাহর যে কোনো স্থান ফাঁকা পেলেই গিলাফ ধরতে, দেয়ালে চুমু দিতে, সীনা লাগাতে ও স্পর্শ করতে, জায়নামায, তসবিহ বা নিজের কাপড় বরকত হিসাবে ঘসতে দেখা যায়। অথচ বাইতুল্লাহর সব স্থান স্পর্শ করা বা চুমু খাওয়া সওয়াবের কাজ নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে কেবল সীমিত কিছু স্থান স্পর্শ করা আর কিছু ক্ষেত্রে চুমু খাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। যা নিম্নরূপ ঃ

১. হাজরে আসওয়াদ

হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা, সিজদার মতো করে কপাল রাখা এবং চুমু খাওয়া এ তিন আমলই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২. রুকনে ইয়ামানী

বাইতুল্লাহর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। এই কোণে ডান হাত বা উভয় হাত দ্বারা স্পর্শ করা সুন্নত। চুমু দেয়া বর্ণিত নেই।

৩. মুলতাযাম

এটি হাজরে আসওয়াদ থেকে বাইতুল্লাহর দরজা পর্যন্ত স্থান। এখানে সীনা, ডান গাল লাগানো এবং ডান হাত উঁচু করে জড়িয়ে ধরে দুআ করার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

৪. কাবা ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরা এবং দুআ করা।

(জামে তিরমিযী ১/১০৫; সহীহ মুসলিম ১/৪১২; মুসান্নাফ, ইবনে আবী শায়বা হাদীস; ১৩৯৬৪; মানাসিক, মোল্লা আলী কারী পৃঃ ১৩৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৫-২৬; আলমুগনী, ইবনে কুদামা ৫/২২৫)

তাওয়াফের সময় কথাবার্তা না বলা

তাওয়াফ অবস্থায় অহেতুক কথা বলা নিষেধ। উচ্চস্বরে যিক্‌র বা দু'আ করবেন না। দুই চক্করের মাঝে কারণ ব্যতিত বিলম্ব করা নিষেধ। ক্ষুধা নিয়ে, প্রস্রাব-পায়খানার চাপ নিয়ে তাওয়াফ করা উচিত নয়। তাওয়াফ অবস্থায় দৌড়াবেন না। অত্যন্ত মনযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে তাওয়াফ সম্পন্ন করবেন।

ইসতিলাম

তাওয়াফের নিয়ত করার পর বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে ফিরে হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে নামাযের প্রথম তাকবীরে যতটুকু হাত উঠানো হয় অর্থাৎ উভয় কান পর্যন্ত উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে ফিরিয়ে এ দু'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَللهِ اَلْحَمْدُ، وَالصَّلَـــــــوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ.

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল হামদ ওয়াসসালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লা।

শুধু বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বললেও হবে। দুআ পড়ার পর হাত নামিয়ে ফেলুন। **মানাসিক-১৩০/১৩১, গুনইয়াতুন্নাসিক ১০২, রদ্দুল মুহতার ২/৪৯৩-৪৯৪**

এরপর সম্ভব হলে না হয় ইস্তেলামের পর এ দু'আ পড়ুন-

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা ওয়া তাসদীক্বান বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআন বিআহদিকা ওয়া ইতিবাআন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দু'আ পড়ার পর হাত নামিয়ে সিজদার সময় যেভাবে হাত রাখা হয়, সেভাবে রেখে হাজারে আসওয়াদে চুমু খাবেন। যদি চুমু দেয়া সম্ভব না হয় উভয় হাত বা এক হাত দিয়ে হাজার আসওয়াদকে স্পর্শ করে হাতে চুমু খাবেন। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে দু'আ পড়ে হাতের তালুতে চুমু দিবেন। এটাকে ইসতিলাম বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ থেকে প্রতি চক্করে আবার হাজরে আসওয়াদে পৌঁছলে পুনরায় ইসতেলাম করতে হবে।

হাজরে আসওয়াদ

হাজরে আসওয়াদ বরকতপূর্ণ জান্নাতী পাথর। হযরত ইবরাহীম আ. কে জান্নাত থেকে এ পাথর দেয়া হয়েছিল, যাতে তিনি তা কা'বা ঘরের কোণে লাগিয়ে দেন। তারপর কুরাইশরা যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করে তখন নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে এ পাথর সংস্থাপন করেন। তাওয়াফের শুরু ও শেষ এ পাথরের সম্মুখ থেকে হয়। প্রথম একটি পাথর ছিল। শিয়া কারামিয়া ফেরকা (শিয়া) লোকেরা ৩১৯ হিজরীতে এ পাথরকে নিয়ে যায়। এরপরে কিছু ঘটনায় পাথরটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বর্তমানে ছোট আটটি টুকরোকে একটি বড় পাথরের মধ্যে রোপার ফ্রেম দিয়ে লাগানো আছে। **(আলমিলাল ওয়ান্নিহাল ২/২৯)**

ভিড়ের সময় হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা

বর্তমানে প্রচন্ড ভিড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া সম্ভব নয়। তাই হাত দিয়ে ইশারা করে নিবেন। অনেকে ধাক্কাধাক্কি করে অন্যদের ভীষণ কষ্ট দিয়ে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। জেনে রাখবেন, চুমু খাওয়া সুন্নাত আর কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম। সুন্নাতের জন্য হারামে লিপ্ত হওয়া জায়েয নেই। তদুপরি এমন করলে আল্লাহ ঘরের আদবের প্রতি মোটেও লক্ষ্য থাকেনা। যদি একেবারে স্বাভাবিক লাইনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য ধাক্কা দেয়া ছাড়া চুম্বন করা যায় তাহলে চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে বুযুর্গ-মুত্তাকী উলামায়ে কেরামদের হজ্জের মওসুমে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করতে দেখা যায় না।

হযরত উমর রা. ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদে চুম দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমর! তুমি শক্তিশালী ব্যক্তি দূর্বলকে কষ্ট দিবে না; খালি পেলে ইসতিলাম করবে তা না হলে তাকবীর বলে চলে যাবে। (বাইহাক্বী)

প্রথম চক্কর শুরু

ইসতিলামের পর সেখানে দাড়িয়ে কাবা শরীফকে বাম দিকে রেখে ঘুরে দাড়ান এবং একটু দ্রুত ও বীরদর্পে (রমল) চলতে থাকুন। এভাবে হাতীমের বাহির দিয়ে হাজার আসওয়াদ পর্যন্ত চকুর পূর্ণ করুন।

রমল

তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল (পুরুষদের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ) করতে হয়। কাঁধ হেলিয়ে একটু দ্রুত বীর দর্পে হাঁটাকে রমল বলে। ভিড়ের মধ্যে বা অসুস্থতার কারণে রমল সম্ভব না হলে প্রয়োজন নেই ।মহিলাদের জন্য রমল করা নিষেধ।

রুকুনে ইয়ামানী

যখন রুকনে ইয়ামানী (হাজার আসওয়াদের বাম দিকের বাবে আযীয বরাবর সামনের কোনা) পৌঁছবেন, তখন কা'বার দিকে বুক না ফিরিয়ে উভয় হাত বা ডান হাত দিয়ে উহা স্পর্শ করা সুন্নাত।

রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন করা

রুকনে ইয়ামানীতে সম্ভব হলে হাতে স্পর্শ করবে, সম্ভব না হলে হাত দ্বারা চুম্বুন বা ইশারা করবেন না। কারণ, এখানে শুধু স্পর্শ করাই প্রমাণিত, চুম্বন বা ইশারা করা হাদীস শরীফে বর্ণিত নেই।

তাওয়াফ শেষ

১ম চক্কর শেষ করার পর হাজরে আসওয়াদ পৌঁছে পুনরায় ইসতিলাম করে ২য় ইস্তিলাম শুরু করুন। এভাবে সপ্তম চক্কর শেষ করে হাজার আসওয়াদের নিকট এসে অষ্টম বারের মত ইসতিলাম করে তাওয়াফ শেষ করবেন। প্রথম ও অষ্টম বার ইসতিলাম সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

ইযতিবা শেষ

তাওয়াফের শেষে ডান বগলের নীচ থেকে কাপড় বের করে উভয় কাঁধ ঢেকে নিবেন।

তাওয়াফের নামায

তাওয়াফের দুই রাকাত নামায ওয়াজিব

তাওয়াফ শেষ করে واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى এই আয়াত পড়ে দুই রাকাআত নামায পড়ুন। **(জামে তিরমিযী ১/১০৫)**

তাওয়াফ শেষ করে এ দুই রাকআত নামায ওয়াজিব। এই দুই রাকাতের ১ম রাকাতে সূরা কাফিরুন ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া মুস্তাহাব। অন্য যে কোন সুরা ও পড়া যাবে।

এই দুরাকাত মাকামে ইব্রাহীমের বরাবর অনেক পিছনে পড়লেও এ মুস্তাহাব আদায় হবে। তবে ভীড়ের কারণে হারামের যে কোন স্থানে পড়লে আদায় হবে। ভিড়ের সময় যেখানেই সম্ভব পড়ে নেওয়া চাই। ইহরাম অবস্থায় হলে মাথা ঢাকা ব্যতিত কাঁধ ঢেকে নিন। **(গুণইয়াতুন্নাসিক ১১৬, রদ্দুল মুহতার ১/৪৯৮)**

তাওয়াফ শেষ করার পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে বা ফরয নামাযের জামাত শুরু না হলে এ দুরাকাত পড়তে দেরী না করা সুন্নাত।

তাওয়াফের পর দুআ খুব কবুল হয়। তাই প্রাণ খুলে কান্নাকাটির সাথে দুআ করুন। যদি সম্ভব হয় মুলতায়ামে যেয়ে দুআ করুন।

মাকরূহ ওয়াক্তে কোন নামায পড়বেন না

যদি মাকরূহ সময়ের তিন ওয়াক্তের কোন এক ওয়াক্তে তাওয়াফ শেষ হয়, (ফজরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সূর্য হেলে যাওয়ার সময় ও আসর পড়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত) তাহলে তখন তাওয়াফের নামায পড়া যাবে না, বরং মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হলে দু'রাকাআত পড়ে নিবেন। তেমনি ভাবে মাকরূহ তিন ওয়াক্তে বায়তুল্লাহ্ শরীফ বা মদীনা শরীফে আসরের পর ক্বাযা নামায ছাড়া কোন নামায পড়বেন না। যদিও হারাম শরীফে কিছু লোককে এ তিন

মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়তে দেখা যায়। অন্যের দেখাদেখি কোন আমল না করে হানাফী মাযাহাবে তা অনুমোদিত কি না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের থেকে জেনে আমল করবেন।

তাওয়াফের নামায কোথায় পড়বেন

অনেক হাজী সাহেবকে ভিড়ের সময় মাকামে ইবরাহীমে বা কা'বা শরীফের নিকটবর্তী স্থানে নামাযে দাঁড়াতে দেখা যায়। এটা মারাত্মক ভুল। অনেকে দুই তিন জনের বেষ্টনীর ভিতরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। এতে তাওয়াফকারীদের ভীষণ কষ্ট হয়। তাই মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়ার সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে হারামে লিপ্ত হবেন না। তাওয়াফের নামায ভিড়ের সময় যেখানে সম্ভব হয়, পড়ে নিবেন। এমনকি মসজিদে হারামের বাইরে হারাম এলাকার সীমানায় পড়লেও আদায় হয়ে যাবে। **(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং ১৫২৬৭, রদ্দুল মুহতার ১/৪৯৯)**

বাইতুল্লাহ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে নামাযে দাড়ানো

অনেকে তাওয়াফের দুই রাকাত অথবা অধিক সাওয়াবের নিয়তে দুই রাকাত নফল নামায মাকামে ইব্রাহীমকে পিছনে রেখে বাইতুল্লাহর একেবারে কাছে নামাযের নিয়ত করে থাকেন। একে তো তাওয়াফকারীদের ভিষণ কষ্ট দেওয়া হয়, যা একেবারেই অনুচিত। আবার তাওয়াফের নামায মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে পড়ার সুন্নাতটিও আদায় হয় না। এ জন্য বাইতুল্লাহ শরীফের একেবারেই নিকটে এবং তাওয়াফের স্থানে ভিড়ের সময় বিশেষ করে তাওয়াফ চলাকালীন কোনভাবেই নামাযের নিয়ত করা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে তাওয়াফকারীদের কষ্ট দেওয়ার কারণে গুনাহের সম্ভাবনা থাকে।

(মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, হাদীসঃ ৮৯৬০; গুনইয়াতুন নাসিক ১১৬; রুদ্দুল মুহতার ২/৪৯৯)

মাকামে ইবরাহীম

এ মুবারক পাথর জান্নাতের ইয়াকুতসমূহের একটি ইয়াকুত পাথর। হযরত ইবরাহীম আ. এ পাথরে দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। লিফটের মত প্রয়োজন মতে এ পাথর উঠানামা করত। যা ইবরাহীম আ. এর একটি জীবন্ত মু'জিযা শত শত বৎসর ধরে বিদ্যমান রয়েছে এবং এর উপর ইবরাহীম আ. এর পদচিহ্ন এখনো বহাল আছে। তাওয়াফের পর এখানে দু'রাকাআত নামায পড়া উত্তম। তবে হজ্জের সময় যেখানে তাওয়াফ হয় সেখানে নামাযের নিয়ত করা কোন ভাবেই উচিত নয়। বরং যেখানে তাওয়াফ হয় না সেখানেই পড়া উচিত।

মাকামে ইবরাহীমকে স্পর্শ করা, চুমু দেয়া কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। বর্তমানে সে পাথরের ছোঁয়া পাওয়া তো সম্ভব নয়, বরং চতুর্দিকে ঘেরাও স্পর্শ করা আরো গর্হিত কাজ। যদিও কাফেররা মূর্তিপূজা করতো তথাপি হাজরে আসওয়াদ এবং এ পাথরে কখনো পুজা করেনি। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি পাথরকে পুজা থেকে হেফাযত করেছেন।

তাওয়াফের সময় দু'আ ও তিলাওয়াত

তাওয়াফের সময় খুব ধ্যানে মাশগুল থাকা চাই। কারণ, তখন দু'আ খুব কবুল হয়। এ সময় অতি প্রয়োজন ছাড়া কোন কথাবার্তা না বলা চাই। তাওয়াফের সময় নির্দিষ্ট কোন দু'আ জরুরী নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াফ অবস্থায় কয়েকটি দু'আ বর্ণিত আছে-

০১. রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজার আসওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় এবং হাজরে আসওয়াদ ও হাতীমের মাঝে এ দু'আ পড়তেন

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْاَبْرَارِ، يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعلَمِيْنَ.

উচ্চারণ

রাব্বানা-আ-তিনা-ফিদ্দুনইয়া-হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার ওয়াআদখিলনাল জান্নাতা

বিলআবরার ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্‌ফারু ইয়া রব্বাল আলামীন।

০২. হাজরে আসওয়াদ ও হাতীমের মাঝে এ দু'আ পড়তেন-

اللَّهمَّ ! قنِّعني بما رزَقْتَني ، وبارِكْ لي فيه ، وأَخْلِفْ على كلِّ غائبةٍ لي بخيرٍ

০৩. পুরা তাওয়াফে এ দু'আটি পড়ার কথাও প্রমাণিত-

لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা)

এছাড়াও নিম্নে বর্ণিত দু'টি দু'আও পড়ার কথা পাওয়া যায়-

ক. اللّٰهُمَّ انى اَسْئَلُكَ الْعفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَة

খ. سُبحانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا اِله اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبر

তাওয়াফে নির্দিষ্ট কোন দু'আ জরুরী নয়

অনেকে তাওয়াফের প্রতি চক্করে পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট দু'আ পড়া জরুরী মনে করেন। দু'আ মুখস্ত না থাকলে বই দেখে অথবা অন্যের সাহায্য নিয়ে পড়তে থাকেন, এটা ঠিক নয়। অর্থ না বুঝে উচ্চারণ শুদ্ধ না করে তাওয়াফের সময় বড় বড় দুআ' পড়ার মূলত কোন প্রয়োজন নেই। তাওয়াফ অবস্থায় যে কোন

দু'আ পড়া যেতে পারে। আরবীতে দু'আ করাও জরুরী নয়। এভাবে বই দেখে সম্মিলিতভাবে পড়ার কারণে অন্যান্যদের একাগ্রচিত্ত ও মনযোগ বিনষ্ট হয়, বরং মনের কথাগুলো নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলে আবেগ থাকে। আবার অনেকে অন্যের সাথে সাথে উচ্চস্বরে পড়তে থাকেন, এর দ্বারা অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে ও অন্রদের কষ্ট দেয়া হয়। এ থেকে বিরত থাকা জরুরী। তবে কারো যদি বর্ণিত আরবী দু'আ সহীশুদ্ধভাবে মুখস্ত থাকে, তা পড়তে পারেন।

তাওয়াফের সময় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েয আছে, তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাওয়াফের সময় তিলাওয়াতের আমল পাওয়া যায় না।

তাওয়াফ শেষ করার পূর্বে জামাআত শুরু হলে বা অযু ছুটে গেলে

তাওয়াফ ও সাঈ শেষ করার পূর্বে ফরয নামাযের বা জানাযার জামাআত শুরু হয়ে গেলে তাওয়াফ ও সাঈ বন্ধ করে কাঁধ ঢেকে জামাআতে শরীক হবেন। জামাত শেষ হলে যেখানে বন্ধ করেছিলেন, সেখান থেকে আবার শুরু করে সাত চক্কর পূর্ণ করবেন। যদি তাওয়াফ বা সাঈ করা অবস্থায় অযু ভেঙ্গে যায়, যদি প্রথম চার চক্কর পূর্ণ করার পূর্বে অযু ভেঙ্গে যায়, তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে করা উত্তম। চার চক্কর পূর্ণ করার পর অযু ছুটে গেলে ওযু করে প্রথম থেকে বা যেখানে ওযু ভেঙ্গে গেছে, সেখান থেকে করতে পারবেন। **(ফাতহুল ক্বাদীর ২/৩৮৯, গুনইয়াতুন্নাসিক ১২৭)**

তাওয়াফের গণনা ভুল হলে

তাওয়াফের সাত চক্কর ভাল ভাবে হিসাব রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃত ভাবে সাত চক্করের বেশী করা গুনাহ। সাত দানার তাসবিহ বা অন্য কোন তরীকায় খুব ভালভাবে হিসাব রাখবেন। সন্দেহের কারণে দু এক চক্কর বেশী করবেন না। কারণ, ইচ্ছাকৃত ভাবে এক চক্কর বেশী করলে আরেকটি তাওয়াফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এখন এক চক্কর বেশী করলে আরেকটি তাওয়াফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এখন এক চক্কর সহ সাত চক্কর পূর্ণ করে এই তাওয়াফ সম্পূর্ণ করতে হবে। তবে সাত চক্কর পরিপূর্ণ না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে সাত চক্কর পরিপূর্ণ করে নিবেন। আর যদি সাত চক্করের গণনায় সন্দেহ হয় তাহলে নিশ্চিত না হতে পারলে কম সংখ্যার হিসেব করে ৭ চক্কর পূর্ণ করবেন।

একাধিক তাওয়াফ শেষ করে একত্রে নামায আদায় করা

অনেকে একটি তাওয়াফ শেষ করে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায না পড়েই কয়েকটি তাওয়াফ সমাপ্ত করেন। পরে একত্রে সব নামায আদায় করেন। এমন করা মাকরূহ। কারণ, তাওয়াফের পর দুই রাকাআত নামায আদায়ের মাধ্যমে তাওয়াফ পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। তাই তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে দেরী না করে তাওয়াফের দুই রাকাআত নামায পড়া চাই। অবশ্য যদি মাকরূহ ওয়াক্তে তাওয়াফ শেষ হয়, তখন একাধিক তাওয়াফ একত্রে করা যায়। মাকরূহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর সবগুলো তাওয়াফের নামায একত্রে পড়ে নিবেন। **(মাসানিকে মোল্লা আলী কারী-৩১০ পৃঃ, শামী-৫১২।**

জামাতবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করা

অনেকে জামাতবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করে থাকেন এবং জামাতের মধ্যে একজন মুখস্' বা বই দেখে দেখে উচ্চস্বরে দুআ পড়েন আর তার সঙ্গে পুরো জামাত সমস্বরে দুআ পড়তে থাকেন। এভাবে তাওয়াফ ও সাঈতে একত্রে উচ্চস্বরে দুআ পড়ার কারণে একে তো অন্যের মনোযোগিতা বিনষ্ট হয়, আবার দলবদ্ধ হওয়ার কারণে প্রচন্ড ভিড় দেখা দেয়। যার কারণে তাওয়াফ ও সাঈ কারীদের অনেক কষ্টের কারণ হয়। এভাবে তাওয়াফ, সাঈ করার রেওয়াজ কোন ভাবেই বর্ণিত নেই। **(বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৪০)**

নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাফেরা

তাওয়াফ অবস্থায় মাতাফে (তাওয়াফের খোলা স্থান) নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলা-ফেরা করা এবং তাওয়াফ ছাড়া অন্য সময় মসজিদে হারামে নামাযী ব্যক্তির সেজদার জায়গা বাদ দিয়ে সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় সেজদার স্থানের মাঝ দিয়ে চলাফেরা থেকে অবশ্যই বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। তবে বিনা প্রয়োজনে তা না করা চাই। এবং তাওয়াফের স্থানে নামাযের নিয়ত করাও ঠিক নয়।

মুলতাযামে উপস্থিতি মুস্তাহাব

হাজারে আসওয়াদ ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলা হয়। মুলতাযামে দু'আ কবুল হওয়ার উত্তম স্থান। তাওয়াফের দুই রাকাআত পড়ার পর বা যে কোন সময় এখানে এসে ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেয়া ব্যতিত সম্ভব হলে বুক ও ডান গাল দেয়ালে লাগিয়ে উপরের দিকে হাত উঠিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করে তাকবীর ও দুরূদ শরীফ পড়ে খুব দু'আ করবেন। শুধু মুলতাযামে কাবা শরীফের দেয়ালে শরীর লাগিয়ে দু'আ করা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

কা'বা শরীফের দরজার চৌকাঠ ধরে দু'আ করার কথা হাদীসে পাওয়া যায়। অন্য কোন স্থানে কা'বা শরীফ স্পর্শ করে দু'আ করার বর্ণনা পাওয়া যায় না। **(সহীহ মুসলিম ১/৪১২, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২২৫-২৬, ইবনে কুদামা ৫/২২৫)**

তাই মক্কা শরীফে অবস্থানকালীন সময়ে বার বার মুলতাযামে এসে এবং কাবা শরীফের দরজার চৌকাঠ করে অন্যকে কষ্ট দেয়া ব্যতিত সম্ভব হলে খুব দু'আ করুন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দু'আ করতেন। তাওয়াফের সময় বা দুআ'র স্থানগুলোতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে থাকবেন। যাতে অন্যের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। বিশেষ করে কোন

ভাবেই যেন মহিলা পুরুষের ধাক্কাধাক্কি না হয়, সেদিকে পূর্ণ খেয়াল রাখবেন।

ইহরাম অবস্থায় বাইতুল্লাহ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন

কাবা শরীফের দেয়ালে স্বাভাবিক ভাবে আতর থাকে। ইহরাম অবস্থায় যেহেতু সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই ইহরাম অবস্থায় মুলতাযামে অথবা কা'বা শরীফের কাছে দু'আ করলে একটু দূরে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে দুআ' করবেন। কারণ কা'বা শরীফের দেয়ালে আতর লাগানো থাকে। যদ্দরুণ দম পর্যন্ত ওয়াজিব হতে পারে।

যমযম

মা হাজেরার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা পিপাসায় কাতর শিশু ইসমাঈলের আবে যমযম বরকতপূর্ণ কূপ। এ পানিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্বলব মোবারক একাধিকবার ধৌত করা হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন লালা এতে ঢেলে দিয়েছেন।

তাওয়াফ শেষ করার পর যমযমের পানি পান করতে যাবেন। বর্তমানে যমযম কুপ দেখার ব্যবস্থা নেই। তাই হাজরে আসওয়াদ বরাবর কিনারে যেখানে টেপ লাগানো আছে, টেপ থেকে যমযমের পানি নিয়ে কাবা শরীফের দিকে ফিরে দুআ' পড়ে তিন শ্বাসে পেট ভরে যমযমের পানি পান করুন। শরুতে বিসমিল্লাহ ও পরে আলহামদুলিল্লাহ্ বলবেন। কিছু পানি মুখে বুকে ছিটিয়ে দিন। পান করার সময় মনে মনে অবশ্যই দুআ করবেন। যমযম পান করে দু'আ করলে কবুল হওয়ার কথা হাদিসে বর্ণিত আছে।

যমযমের পানি পান করার দুআ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ-

উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আসআলুকা ইলমান্ না-ফিআ' ওয়া রিযকাওঁওয়া-সিআ' ওয়া শিফা-আম মিং কুল্লি দা-ইন।

যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা

অনেকে মনে করেন যমযম দাঁড়িয়ে পান করতে হয়। মূলত যমযমের পানি দাঁড়িয়ে এবং বসে পান করা যায়। তবে অনেকে দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব বলেছেন। যমযমের পানি দ্বারা অযু করা যায়; তবে এস্তেঞ্জা করা, নাপাকি দূর করা জায়েয নাই।

হাতীম ও মীযাবে রহমত

হাতীমে নামায পড়া কাবা শরীফের ভেতরে নামায পড়ার ন্যায়। কারণ, হাতীম কাবা শরীফের অংশ। সম্ভব হলে হাতিমের ভিতরে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে দু চার রাকআত নামায পড়ার চেষ্টা করবেন। বেশী ভিড় হলে হাতিমের ভিতরে এবং মীযাবে রহমতের নিচে দাঁড়িয়ে খুব দু'আ করবেন। হাতিমে ভিতরে কা'বার অংশ হিসাবে দু'আ খুব কবুল হয়।

উমরার ৩য় কাজ

সাঈ

(উমরার ১ম ওয়াজিব)

সাফা মারওয়ায় সাত চক্কর দেয়াকে সাঈ বলে। তাওয়াফ ছাড়া সাঈ করা যায় না। অতএব, নফল ওয়াফের মত নফল সাঈ করা যাবে না।

(রদ্দুল মুহতার পৃ: ২/৫০২, গুনইয়াতুন্নাসেক পৃ: ১৩৫)

সাঈর শুরুতে ইসতিলাম

যমযমের পানি পান করার পর সাঈর পূর্বে নবম বার ইসতিলাম করা মুস্তাহাব অর্থাৎ সম্ভব হলে চুমু দিয়ে না হয় হাতে ইশারা দিয়ে হাতেই চুমু দিয়ে সাঈর উদ্দেশ্যে সাফা মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন।

সাফা পাহাড়ের কিছু মূল অংশ পাথর বিহীন আয়নায় ঘেরাও করা রাখা আছে। ভিড় না থাকলে এবং কষ্ট না হলে সেখানে কিছু সময় দু'আ করবেন।

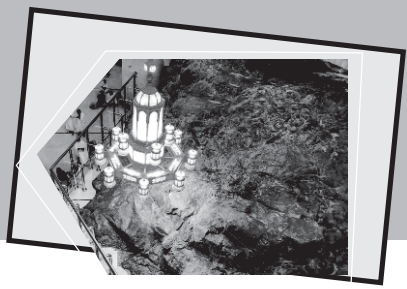

সাঈর নিয়মাবলী

নিয়ত

সাঈর জন্য নিয়ত করা মুসতাহাব। সাফা পাহাড়ে সামান্য উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সাঈর নিয়ত করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উমরার সাঈ করছি।

অযু অবস্থায় পায়ে হেঁটে সাঈ করা ওয়াজিব। অসুস্থতা বা বার্ধ্যক্যের কারণে সম্ভব না হলে হুইল চেয়ারে বসে করবেন। সাঈর নিয়ত করে **সাফা পাহাড়ে আরোহন করে এ দু'আটি বর্ণিত আছে-**

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ-

উচ্চারণ

ইন্নাস্‌সফা- ওয়াল মারওয়াতা মিং শা'আ-ইরিল্লাহি নাবদাউ বিমা-বাদাআল্লা-হু।

সাফা ও মারওয়ার উচুঁ স্থানে উঠার সময় কুরআনের এ আয়াত পড়বেন, যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন-

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌعَلِيْمٌ.

উচ্চারণ

ইন্নাস্‌সফা-ওয়াল মারওয়াতা মিং শা'আ-ইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আও'তামারা ফালা-জুনা-হা আলাইহি আয়্যাত্তাওয়াফা বিহিমা-ওয়া মাং তাত্বওয়াফা খায়রাং ফাইন্নাল্লা-হা শা-কিরুন আলী-ম।

সাফা পাহাড়ে যা করনীয়

সাঈর নিয়ত করার পর সাফা পাহাড়ের এমন স্থানে উঠবেন, যেখান থেকে কা'বা শরীফ দেয়া যায়।

তারপর তিনবার আল্লাহু আকবার ও তিনবার নিম্নোক্ত দু'আ পড়ুন-

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ওয়াহদাহু লা-শারী-কালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা-কুল্লি শাইইং ক্বাদী-র।

এরপর সম্ভব হলে এ দু'আ পড়ুন-

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

এরপর দুরূদ মরীফ পড়ে উভয় হাত উঠিয়ে যা মনে আসে মন ভরে দু'আ করে নিন এখানে দুআ' কবুল হয়।

মারওয়া

সাফা থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে স্বাভাবিক গতিতে চলুন। সবুজ দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানে পুরুষদের জন্য একটু দ্রুত গতিতে অতিক্রম করা মুস্তাহাব। মহিলাদের জন্য তা নিষিদ্ধ মহিলারা সাধারণ গতিতে চলবে। এ স্থান অতিত্রম করার সময় এ দু'আ পড়া মুস্তাহাব-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

উচ্চারণ

রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ওয়াতাজা-ওয়ায আম্মা-তা'লাম ইন্নাকা আংতাল আআয্যুল আকরাম।

এছাড়া সাঈর সময় যে কোন দু'আ মনে চায়, করতে পারেন। সাঈর সময় অমনযোগী হয়ে গল্প গুজব করে সাধারণ হাঁটার মত যেন না হয়। বরং মনোযোগ সহকারে মনে মনে খুব দু'আ করুন। এ সময় দু'আ কবুল হয়।

সাঈর সময় নির্দিষ্ট দু'আ জরুরী নয়

অনেকে তাওয়াফের মত সাঈতেও নির্দিষ্ট কিছু দু'আ জরুরী মনে করেন। এটা ঠিক নয়, সাঈতে যে কোন দু'আ করা যায়। বই দেখে দু'আ পড়া বা এক সাথে কয়েকজন মিলে পড়ার কোন অর্থ নেই, এভাবে বর্ণিতও নেই। বরং অন্যের মনোযোগ নষ্ট করা হয়।

(গুনইয়াতুন্নাসিক ১২৯, আদ্দুররুল মুখতার ২/৫০০)

মারওয়া পাহাড়

মারওয়ায় পৌঁছে কিবলার দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দু'আ করে নিন। এখানেও দু'আ খুব কবুল হল। এভাবে এক চক্কর পূর্ণ হল। এরপার পুনরায় সাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিন, সবুজ পিলারে পূর্বের মত আমল ও দু'আ করুন। মারওয়া থেকে সাফায় দ্বিতীয় চক্কর, এভাবে মারওয়া এসে সাত চক্কর পূর্ণ হবে। **(রদ্দুল মুহতার ২/৫০১)**

- সাফা থেকে মারওয়ার দূরত্ব প্রায় ৪৫০ মিটার। সপ্তম চক্কর ওয়ারওয়ার শেষ হওয়ার পর কিবলার দিকে ফিরে হাত তুলে খুব দু'আ করে নিন। সাঈ শেষ করার পরও দু'আ কবুল হয়।
- এরপর মসজিদে হারামে গিয়ে সম্ভব হলে দু'রাকাত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। **(রদ্দুল মুহতার ২/৫০১)**

সাঈতে ইসতিলাম করা

অনেকেই সাফা মারওয়ায় উঠার সময় ইসতিলামের ন্যায় হাত উঠিয়ে চুমু দেন, এমন কিছু বর্ণিত নেই।

সাঈর শর্ত

ক. নিজের সাঈ নিজের করা

খ. প্রথমে তাওয়াফ করে পরে সাঈ করা।

ঘ. সাফা থেকে শুরু করা এবং মারওয়া গিয়ে শেষ করা।

সাঈর ওয়াজিব

১. পায়ে চলে সাঈ করা (তবে ওয়রবশত কোন কিছুতে আরোহন করেও সাঈ করা যায়)।

২. সাত চক্কর পূর্ণ করা।
৩. সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করা।

সাঈর সুন্নাত

১. হাজরে আসওয়াদে ইসতিলাম করে দিয়ে সাঈর জন্য বের হওয়া।
২. তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে সাঈ করা।
৩. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করা।
৪. সাফা ও মারওয়ায় আরোহণ করে কেবলামুখী হওয়া।
৫. সাঈর চক্করগুলো একটির পর একটি আদায় করা।
৬. পুরুষেরা সবুজ স্তম্ভ দু'টির মধ্যবর্তী স্থানটি একটু দৌড়ে অতিক্রম করা।

সাঈর মুস্তাহাব

১. নিয়্যত করা।
২. সাফা এবং মারওয়ায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা।
৩. কাকুতি মিনতি ও বিনয়ের সাথে যিক্‌র আযকার ও দু'আ করা।
৪. সাঈ সমাধা করে বায়তুল্লাহ্ শরীফে দু' রাকাআত নামায পড়া।

সাঈর মাকরূহ

১. বেচাকেনা করা।
২. অনর্থক কতাবার্তা বলা।
৩. সাঈর চক্করসমূহ পরপর আদায় না করা।
৪. সাফা ও মারওয়ায় পাহাড়ের উপর আরোহণ না করা।
৫. ওযর ব্যতীত তাওয়াফের পর সাঈ করতে বিলম্ব করা।
৬. পুরুষেরা সবুজ চিহ্নিত স্তম্ভের মাঝে না দৌড়ানো।

উমরার চতুর্থ কাজ

হলক বা কসর

(২য় ওয়াজিব)

হজ্জে তামাত্তুকারী এবং শুধু উমরা পালনকারী পুরুষ হলে সাইর পর মাথার চুল হলক করে নিবেন। হলক করা হুযুর সা. এর সুন্নাত। তবে চুল ছোট করাও জায়েয আছে। চুল ছোট করতে চাইলে কমপক্ষে মাথার চুলের এক চুতুর্থাংশ (এক ইঞ্চি পরিমাণ) ছেঁটে ইহরাম থেকে মুক্ত হবেন। যদি আগে থেকে মাথার চুল এক ইঞ্চির থেকে কম থাকে তাহলে ছোট করা যাবে না বরং অবশ্যই মাথা মুন্ডাতে হবে। মাথায় যদি একেবারে চুল না থাকে বা মুন্ডানো থাকে তাহলে ক্ষুর বা ব্লেড চালিয়ে নিন। ক্বিরান পালনকারী উমরা করার পর হলক করতে পারবেন না। বরং হজ্জের সব আমল শেষ করে হলক বা চুল কাটবেন।

মহিলাদের জন্য চুল কাঁটা

মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডানো হারাম, বরং তারা নিজ বাসস্থানে মাথার চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাঁচি দিয়ে কেটে নিবেন। অন্য পুরুষের সামনে চুল খুলে কাটা বা অন্য পুরুষের হাতে চুল কাটা জায়েয নেই। (গুনইয়াতুন্নাসিক ১৭৩)

মাথার কিছু অংশ চুল কাঁটা

কিছু সংখ্যক লোক কাঁচি হাতে সামান্য কয়েকটি চুল কেটে ইহরাম খুলে নেন। এভাবে ইহরাম খুলে কাপড় পড়ে নিলে হালাল হয় না। তাই হালাল হওয়ার পূর্বেই সিলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করার কারণে দম পর্যন্ত ওয়াজিব হতে পারে। অবশ্য বড় ফোঁড়া বা আঘাত জনিত কারণ থাকলে চুল কাটা ব্যতিত হালাল হওয়া যাবে।

ইহরামের শেষে সাঈর পর নিজে চুল কাঁটা

হজ্জ ও উমরায় যখন সব আমল সম্পন্ন হয়ে যায় এবং শুধু হলক বা চুল কাঁটা বাকি থাকে, তখন নিজের এবং অন্যের চুল কাটতে পারবেন। এর পূর্বে নিজের বা অন্যের চুল কাটলে দম ওয়াজিব হবে।

উমরা সম্পন্ন

এভাবে উমরার কাজ শেষ হয়ে গেল। উমরার কাজ সম্পন্ন করার পর তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীগণ হালাল হয়ে যাবেন। ক্বিরানপালনকারী উমরাহ করার পর ইহরামের সাথে কাটাবেন এবং ইফরাদ পালনকারীগণ মক্কা শরীফে পৌঁছে উমরাহ করা ব্যতিত হজ্জ পযন্ত ইহরামের সাথে থাকবেন। তামাত্তু হজ্জপালনকারীদের উমরার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ৭ই যিলহজ্জ পর্যন্ত হজ্জের আর কোন আমল নেই।

নফল তাওয়াফ

মক্কা শরীফে অবস্থান কালে হজ্জের পূর্বে উমরার চেয়ে নফল তাওয়াফের সাওয়াব অধিক। তাই দৈনিক নফল তাওয়াফ বেশি বেশি করতে চেষ্টা করবেন। উমরাহ-এর তাওয়াফের মতই নফল তাওয়াফ করবেন। নফল তাওয়াফের পরও দু'রাকাআত নামায পড়া ওয়াজিব। তবে নফল তাওয়াফে ইহরাম পরিধান, ইযতিবা, রমল ও সাঈ করতে হয় না।

মিনা যাওয়ার অপেক্ষায় মক্কা শরীফ অবস্থান কালীন সময়

এর পর হজ্জ পর্যন্ত দিনগুলো তেমনিভাবে হজ্জ থেকে ফারিগ হওয়ার পর যে কয়দিন মক্কা শরীফে অবস্থান করতে হয় সেদিনগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত যেন কোন না কোন আমলের মধ্যে কাটে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। যথা সম্ভব নফল তাওয়াফ করবেন, না হয় অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীতে সময় বেশী ব্যয় করবেন। ঘুম ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইতুল্লাহ শরীফেই সময় ব্যয় করতে চেষ্টা করবেন। ইশরাক, চাশত, আওওয়াবীন, তাহিয়্যাতুল ওযু ইত্যাদি নামাযের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিবেন। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামায প্রতিরাতে যেন পড়তে পারেন সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

মোট কথা জীবনের এ মহা মূল্যবান সময়গুলোর সদ্ব্যবহার যেন হয়। অনর্থক কথাবার্তা, গীবত-শিকায়াত, অযথা আড্ডায় যেন সময় ব্যয় না হয়। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখবেন যে, মক্কা শরীফে সাওয়াব যেমন লক্ষ গুণ পাওয়া যায়, তেমনিভাবে গুনাহের বেলায়ও অত্যন্ত সতর্ক থাকা চাই।

শেষ সা'দী রহ. বলেন- "রাজ দরবারে দান সামগ্রী প্রচুর পাওয়া যায় বটে, তবে গলাকাটার আশংকাও বেশী।

- পুরুষের এক ওয়াক্ত নামাযও যেন জামাত ও তাকবীরে উলা ব্যতিত পড়া না হয়। মসজিদে হারামে অধিক হারে যমযমের পানি পান করুন। স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখুন। আপনার অবহেলার দরুন যেন হজ্জের দিনগুলোতে অসুস্থ না হয়ে পড়েন।

কা'বা শরীফে ১২০ টি রহমত

কিতাবে উল্লেখ আছে- কাবা শরীফে প্রতি মূহুর্তে ১২০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। ৬০টি রহমত তাওয়াফ কারীদের উপর এবং ৪০টি রহমত নামায আদায়কারীদের উপর আর ২০টি রহমত বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে নযরকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়। অতএব, মক্কা শরীফ অবস্থান কালে যত বেশী সম্ভব হারাম শরীফে অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতে চেষ্টা করবেন।

দু'আ কবুলের স্থানসমূহ

হজ্জের সফরে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান কালীন প্রতিটি মুহূর্তকে গণিমত মনে করে দীর্ঘ সময় নিয়ে একাগ্রচিত্ত কান্নাকাটির মাধ্যমে দু'আ করলে সব সময় এবং সব স্থানেই দু'আ কবুল হয় তবে কয়েকটি স্থানে বিশেষ ভাবে দু'আ কবুল হয়ে থাকে। যেমন–

০১. ক্বাবা ঘরে প্রথম দৃষ্টি পড়তেই যে দু'আ করা হয় সে দু'আ কবূল হওয়া কথা উলামায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায়। এ জন্য এভাবে দু'আ করা চাই– " হে আল্লাহ! এ সফরের সব দু'আ কবুল করে নিন।

০২. হাজারে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহ্ শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে মুলতাযাম।
০৩. বাইতুল্লাহ্ শরীফের ভিতর ও দরজার সামনে।
০৪. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যেবর্তী স্থানে।
০৫. হাতীমের ভিতরে।
০৬. মীযাবে রাহমাতের নিচে।
০৭. মাতাফে– (তাওয়াফ করার জায়গা)।
০৮.হাজরে আসওয়াদের সামনে ও নিকটে।
০৯. সাঈ কারার স্থানে।
১০. কা'বা ঘরের চারদিকে।
১১. তাওয়াফের সময়।
১২. রুকনে ইয়ামানীতে।
১৩. মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে।
১৪. যমযম কূপের নিকটে।
১৫. সাফা ও মারওয় পাহাড়ের উপর ও মধ্যবর্তী সবুজ গুম্বোজের মধ্যবর্তী স্থানে।
১৬. মীনার ময়দান।
১৭. মসজিদে খায়েফ।
১৮. আরাফার ময়দানে ও জাবালে রহমাতে। (তবে আরাফার দিন জাবালে রহমতে উঠা নিষেধ)
১৯. মুযদালিফায় বিশেষ করে মাশআরুল হারামে।

ধারাবাহিক ভাবে
হজ্জের ০৫ দিনের আমল

হজ্জ পালনে শারিরিক অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। পূর্বের যামানায় যখন মানুষ পায়ে হেঁটে বা সমুদ্র সফরে হজ্জের সফর করতেন, তখন বাস্তবিক অনেক মুজাহাদার সাথে আল্লাহর আশিকগণ হজ্জের কাজ সম্পন্ন করতেন। যা আজকের দিনে কল্পনাও করা যায় না। এ কারণেই তখনকার দিনে আল্লাহর আশিকগণ হজ্জের রুহনিয়াত নিয়ে দেশে ফিরতেন। হজ্জের সফরে কষ্টের দিকে লক্ষ করেই আল্লাহর রাসূল হজ্জের নিয়তের মধ্যে 'আল্লাহ সহজ করে দাও' দুআ' শিখিছেন। অন্য কোন ইবাদতের বেলায় সহজ করার দুআ' পাওয়া যায়না। যদিও বর্তমানে ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আরাম-আয়েশের সব ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।

তারপরেও বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচন্ড ভিড়ের কারণে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা থাকা সত্বেও অনাকাঙ্খিত অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে হজ্জের পাঁচদিন মুআল্লিমের বাস সময়মত না আসা, বাসে উঠতে প্রচন্ড ধাক্কাধাক্কি, মিনার তাঁবু দূরে হওয়ার দরুন পাথর নিক্ষেপ করতে আসা-যাওয়ার দূরত্বের কারণে কষ্ট বেশী হওয়া বাথরুমের সল্পতার কারণে দীর্ঘ লাইনের অসহনীয় যন্ত্রনাসহ অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এসব মুহূর্তে অবশ্যই ধৈর্য্যের পরিচয় দেয়া উচিত। তখন অনেককেই ঝগড়া ঝাটি করতে দেখা যায়। যা ইহরামের অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষেধ এবং হজ্জের উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ। মীনা, মুযদালিফা, আরাফার ময়দানের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এ বিষয়গুলো মনে রাখলে অনেক কষ্টের মাঝেও ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে।

৭ই যিলহজ্জ

৭ তারিখ বাদ যোহর হজ্জের নিয়ামবলীর উপর খুতবা প্রদান করা সুন্নাত। হারাম শরীফে প্রদত্ত খোতবা নিজে না বুঝলে কোন আলেমের কাছ থেকে বুঝে নিলে ভাল। বর্তমানে হজ্জের পূর্বের জুমআর খুতবায় হজ্জের যাবতীয় আহকাম বর্ণনা করে দেন। আলাদা খুতবা হয় না।

হজ্জের ইহরাম (ফরজ)

তামাত্তু পালনকারী উমরার আলোনায় বর্ণনা অনুযায়ী ইহরামের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ইহরামের কাপড় পড়ে নিন। এরপর সম্ভব হলে মসজিদে হারামে, না হয় ঘরে-ই (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) পূর্বের নিয়মানুযায়ী দুই রাকা'ত নামায পড়ে নিন। তবে মহিলাগণ নিজ হোটেলে ইহরাম বাঁধাই উত্তম।

হজ্জের নিয়ত এভাবে করবেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْه مِنِّيْ

'আয় আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জের (তামাত্তু) নিয়ত করছি। আপনি এই হজ্জ আমার জন্য সহজ করে দিন এবং তা কবুল করে নিন'।

হজ্জে ক্বিরান বা ইফরাদ হলে নতুন করে ইহরাম ও নিয়তের প্রয়োজন হবে না। কারণ তারা পূর্বে থেকেই ইহরাম অবস্থায় আছেন।

বদলী হজ্জ হলে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত

আয় আল্লাহ! আমি এর পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করছি, আপনি এই হজ্জ সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

নিয়ত করে তিনবার তালবিয়া পড়ে নিবেন। মহিলারা নীরবে পড়বেন। নিয়ত করে তালবিয়া পড়া মাত্রই ইহরাম শুরু হয়ে যাবে। এরপর ৭ বা ৮ই যিলহজ্জ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় প্রয়োজনীয় আসবাবসহ (যাদের সাথে মহিলা আছে তারা আরাফাতের ময়দানে পর্দার জন্য অতিরিক্ত চাদর নিয়ে) মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।

হজ্জের মধ্যে তালবিয়ার সময়

হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর থেকে যত বেশী সম্ভব তালবিয়া পড়তে থাকুন। ১০ই যিলহজ্জ ১ম কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকুন। কংকর নিক্ষেপের পর আর তালবিয়া পড়া যাবে না।

মিনা, আরাফাহ ও মুযদালিফায় অধিক পরিমান তালবিয়া পড়া

ইহরাম বাঁধার পর থেকে ১০ তারিখ কংকর মারার আগ পর্যন্ত স্বশব্দে বেশী বেশী তালবিয়া পড়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। অথচ মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় অবস্থানকালে অধিক পরিমাণে তালবিয়ার আমল করতে দেখা যায় না। অলসতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে অধিক পরিমানে তালবিয়া পড়া চাই। তালবিয়া যখন পড়বেন, তখন একত্রে তিনবার পড়া মুস্তাহাব। **(সহীহ মুসলিম ১/৪১৫; মানসিক ১০৩)**

৮ তারিখের পূর্বেই মিনায় রওয়ানা হওয়া

যদিও ৮ তারিখ সুর্যোদয়ের পর মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত তবে বর্তমানে ভিড়ের কারণে ৭ তারিখ রাতেই মুআল্লিমের গাড়ীতে সুযোগ মত রওয়ানা হতে হয়, ভিড়ের কারণে এতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ ৭ তারিখ বিশেষ কোন আমল নেই। যেহেতু মিনায় তাঁবু খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন, আবার তাঁবুতে ঠিক ভাবে স্থান করে নেওয়াও বর্তমানে অনেক জটিল। তাই মুআল্লিমের গাড়িতে কাফেলার সঙ্গ ছাড়বেন না। অবশ্য যদি শারীরিক শক্তি ও মান সাহস থাকে, তাহলে কিছু সাথী নিয়ে পায়ে হেঁটে ৮ তারিখ সূর্যোদ্বয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে পারলে তা উত্তম। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২২৭)**

১০ই যিলহাজের পূর্বে হজ্জের সাঈ করা

১০,১১,১২. তারিখ হজ্জের সাঈ করা ওয়াজিব। তবে যদি কেহ ভীড়ের ভয়ে মীনায় যাওয়ার পূর্বে সাঈ করতে চান, হানাফী মাযহাবে এর সুযোগ আছে, করতে পারবেন। তবে শর্ত হল সাঈর পূর্বে ইহরাম বেঁধে ইযতিবা ও রমল সহকারে একটি নফল তাওয়াফ করতে হবে। ভিড়ের দরুন মহিলা ও বৃদ্ধের জন্য হজ্জের পূর্বে সাঈ করে ফেলা ভাল। তবে বর্তমানে সাঈর স্থান অনেক বড় করা হয়েছে, আগের মত কষ্ট হয় না। তাই বেশী দুর্বল না হলে ১০,১১, ও ১২ তারিখে সাঈ করা উত্তম।

মিনায় উদ্দেশ্য রওয়ানা

৮ যিলহজ্জ হজ্জের প্রথম দিন
মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও রাত্রি যাপন

৮ তারিখ সকলকে ইহরাম অবস্থায় মিনায় যেতে হয়। এখান থেকে হজ্জের কাজ শুরু হয়। ৮ই যিলহজ্জ যোহর থেকে পরের দিন ফজর পর্যন্ত মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা সুন্নাত। **(গুনইয়াতুন্নাসিক ১৪৬)**

৮ই যিলহজ্জ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ৯ যিলহজ্জ সকাল পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা মুস্তাহাব। ৮ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।

মিনায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে দু'চার রাকাত নফল নামায পড়ে নিবেন। এসময় বেশি বেশি তালবিয়া ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়া হাদীস শরীফ থেকে বর্ণিত।

'মিনায় রওয়ানা হলাম', কথাটা খুব সহজ, কিন্তু এর ভাব ও মর্ম বড় কঠিণ! মিনা তো কোরবানির ময়দান! দুনিয়ার সমস্ত মুহাব্বতকে আল্লাহর মুহাব্বতের ছুরি দিয়ে কোরবানি করার ময়দান! সেই ময়দানে যারা রওয়ানা হবে তাদের তো এখনই প্রতিজ্ঞা করতে হবে আল্লাহর হুকুমের সামনে নফসের সব খাহেশাতকে (চাহিদা) বর্জন করার! আল্লাহর মুহাব্বাতের মুকাবেলায় সমস্ত মুহাব্বতকে কুরবান করার! কিন্তু কোথায় আমার দিলের সেই হালাত! দিল তো হে আল্লাহ, তোমারই হাতে! তুমি পয়দা করে দাও দিলের সেই কাইফিয়াত ও অবস্থা যা তোমার পছন্দ! তোমার খলীল ইবরাহীমের, তোমার যাবীহ ইসমাঈলের সেই ত্যাগ ও কোরবানির সামান্য কিছু ছায়া ও ছোঁয়া আমাদেরও কলবে দান করো হে আল্লাহ! নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা এ সকল পাহাড় সাক্ষী! চার হাজার বছর আগে এখানে এই পবিত্র ভূমিতে রচিত হয়েছিলো আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করার এবং কোরবান হওয়ার অনন্য ইতিহাস! এখানে আল্লাহর খলীল হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর মুহাব্বতকে

কবুল করে প্রিয়তম পুত্রের মুহাব্বতকে কোরবান করেছিলেন।

পুত্রের গলায় নয়, আসলে তিনি তো ছুরি চালিয়েছিলেন দুনিয়ার সমস্ত গায়রুল্লাহর গলা! ইবরাহীমী কাফেলার প্রত্যেক সৌভাগ্যবান যাত্রীকে তাই এখানে আজ মুহাব্বাতের কোরবানী করতে হবে। আল্লাহর মুহাব্বতের পথে যা কিছু বাঁধা হয়ে, দাঁড়ায় সব কিছুর গলায় ছুরি চালাতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আমার আপন কিছু নেই। আমার যা কিছু প্রিয়, সব আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত!

এখানে এই পবিত্র ভূমিতে সৌভাগ্যবান পিতার সৌভাগ্যবান সন্তান নিজেকে পেশ করেছিরেন আল্লাহর রাস্তায় কোরবান হওয়ার জন্য। এখানে মরুভূমির বালুকণা এবং পাহাড়শ্রেণী হয়ত সেদিন শুনেছিলো এমন কোন অভিব্যক্তি-

> 'হে আল্লাহ! তোমার প্রেমে নিজেকে আমি উৎসর্গ করবো। তুমি যদি চাও, তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি জান কোরবান করবো। আমার গলায় ছুরি চলুক, তবু আমার কলবে তোমার মুহাব্বত যিন্দা থাকুক! তুমি যদি আমাকে কবুল করো হে আল্লাহ , তাহলে তো না যিন্দেগির ফিকির, না মওতের পরোয়া'।

আল্লাহকে ভালোবেসে, আল্লাহর মুহাব্বাতে অবিচল থেকে এই যে অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানি, এ জন্যই তো পিতা ইবরাহীম হলেন খালীলুল্লাহ, আর পুত্র ইসমাঈল হলেন যাবীহুল্লাহ! আল্লাহর মুহাব্বতকে সর্বোচ্চ রাখার এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বস্ব কোরবান করার আবেগ ও জাযবা এবং শিক্ষা ও দীক্ষাই এ পবিত্র ভূমি থেকে নিয়ে যেতে হবে মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রত্যেক পিতা ও পুত্রকে।

নয় তারিখে মিনার রাত বড় বরকতের রাত। হাদীছ শরীফে এর ফযীলতের কথা এসেছে। সুতরাং যথাসম্ভব বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ-ইসতিগফারে মশগুল থাকাই কর্তব্য। কিন্তু মিনার বরকত ও ফযীলতওয়ালা রাত বহু মানুষেরই উদাসীনতা ও গাফলত এবং বেহুদা গল্পগুজব ও অর্থহীন ব্যস্ততার মাঝেই কেটে যায়। তবে আশা ও সান্তনার কথা এই যে, হযরত হাফেজ্জী হুযুরের মত আশিকদিল ও প্রেমিকহৃদয় বান্দাদের হুঁশিয়ার করতে থাকেন। আল্লাহর এ সকল নেক বান্দার ফয়য ও বরকতেই হজ্জ এখনো যিন্দা রয়েছে; মিনা-আরাফা-মুযদালিফায় চৌদ্দশ বছরের নূরানিয়াত ও রূহানিয়াত ক্ষীণধারায় হলেও এখনো বহমান রয়েছে।

(বাইতুল্লাহর মুসাফির)

মিনা, মুযদালিফা, আরাফায়

কসর নামায পড়বে কি না?

কেউ যদি মিনা যাওয়ার পূর্বে এক সাথে ১৫ দিন থাকার নিয়তে মক্কা শরীফ অবস্থান করেন তাহলে তিনি নিশ্চিত মুকীম। মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফায় যোহর, আসর ও ইশা পূর্ণ নামায পড়বেন, কসর করবেন না। আর যদি হজ্জের আগে মক্কা শরীফে অবস্থান এবং মিনা মুযদালিফাসহ ১৫ দিনের কম হয়– তাহলে তিনি নিশ্চিত মুসাফির। এ দু বিষয়ে কারও দ্বিমত নাই।

অতএব, মক্কা শরীফ ও মিনা, মুযদালিফায় ৪ রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায একাকী পড়লে দুই রাকাত কসর করতে হবে। এমনিভাবে মহিলারা ঘরে নামায পড়লে কসর পড়বে। তবে মুকীম ইমামের পিছনে নামায পড়লে ৪ রাকাত-ই পড়তে হবে।

কিন্তু মিনায় যাওয়ার পূর্বে যদি ১৫ দিন না হয় বরং মক্কা শরীফ ও মিনায় উভয় স্থানের অবস্থানসহ ১৫ দিন হয়, তখন সে পূর্ণ নামায পড়বে, না কসর করবে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামাদের থেকে দু ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

কোন কোন মুফতী সাহেবগণ বলেন, বর্তমানে মক্কা নগরী ও মিনার বসতি মিলে যাওয়ার কারণে এবং সরকার মিনাকে মক্কা সিটির অন্তর্ভূক্ত করে দেয়ার কারণে মক্কা শরীফ ও মিনা একই শহর গন্য হবে। যার কারণে উভয় স্থান মিলে ১৫ দিন হলেই মুকীম হওয়ার মতামত দেন। অতএব, তারা পূর্ণ নামায পড়বেন। আবার অনেক আলেম বলেন, মিনা যদিও বর্তমানে মক্কা সিটির অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু অধিকাংশ বাংলাদেশী হাজীদের তাঁবু মুযদালিফায় থাকে। মাঝখানে অনেক বসতিহীন জায়গা রয়েছে। যার কারণে শুধু মক্কা শরীফে যদি ১৫ দিন অবস্থান হয় তাহলেই মুকীম হবেন। মক্কা শরীফ ও মিনা উভয় স্থান মিলে যদি ১৫দিন হয় তাহলে তারা মুকীম হবেন না।

অনেক উলামায়ে কেরামের মতে বর্তমানে মিনা, মুযদালিফা, আরাফাসহ ১৫ দিনের হিসাব হবে। কেননা, মুকীম হওয়ার জন্য রাত্রিযাপন শর্ত। আরাফায় রাত্রি যাপন হয় না বিধায় মুযদালিফা ও আরাফার মাঝে বসতহীন বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তা ধর্তব্য নয়।
(বাদায়িউস্‌সানায়ে ১/২৭০, মানাসিক ১৯৫)

নিজ এলাকা ত্যাগ করার পর মুসাফিরের হুকুম শুরু হয়, তাই আমাদের দেশেও নিজ এলাকার সীমানা গ্রাম, ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশন সংসদীয় এলাকাগুলোর মধ্যে কোন এলাকা ত্যাগ করলে মুসাফিরের হুকুম শুরু হবে তা নিয়ে অনেক গবেষণার পরও সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন। কারণ, বসতহীন এলাকাগুলো ঘনবসতী হয়ে যাওয়ার কারণে মুসাফিরের জন্য শেষ সীমানা নির্ধারন করা বর্তমানে কঠিন হয়ে পরেছে।

যেহেতু উভয় মতে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী এবং উভয় মতের স্বপক্ষে দলিল রয়েছে; তাই মিনা, মুযদালিফা, আরাফায় মুসাফির না মুকীম, এ ব্যাপারে কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া না চাই। কারণ, হজ্জ অনেক বড় ঐক্যের প্রতিক। বরং নিজের সাথে থাকা বা আশ-পাশের হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরাপর্শ করে সে মতে আমল করে নিবেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম এর হজ্জের সফরে কসর পড়া হজ্জের বিশেষ আমল হিসাবে নয়, বরং মুসাফির হওয়ার কারণে

অনেকে হজ্জের দিনগুলোতে হাজী সাহেবদের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রচারণা চালান যে, হজ্জের পাঁচ দিন, চাই সে মুকীম হোক বা মুসাফির, অবশ্যই যোহর, আসর, ইশা দুই রাকাত কসর পড়তে হবে। কারণ, এটি হজ্জের জন্য স্বতন্ত্র হুকুম। দলীল হিসেবে পেশ করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের দিনগুলোতে যোহর, আসর, ইশা দুই রাকআত কসর পড়েছেন।

এমন দলীল পেশ করা ঠিক নয়। কারণ-

১. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে (প্রায় ৪৫০ কি.মি) সফর করে আসেন এবং মক্কা শরীফে হুযুরের নিজস্ব বাড়ি না থাকার দরুন তিনি মুসাফির ছিলেন বিধায় যোহর, আসর দু'রাকাআত পড়েন।

২. এ কারণেই ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসটি হজ্জ অধ্যায়ে আনেননি, বরং মুসাফিরের কসর নামাযের অধ্যায়ে এনেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের কারণে দুই রাকাআত পড়েননি, বরং মুসাফির হওয়ার কারণে দুই রাকাআত পড়েছেন।

৩. এ কারণেই হযরত উসমান গণি রা. তার খেলাফত কালে হজ্জের সফরে চার রাকাআত আদায় করেছিলেন। কারণ, মক্কা শরীফে তিনি মুকীম ছিলেন।

৪. এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে প্রবেশ করেই বলে দিয়েছেন-হে আহলে মক্কা! তোমরা তোমাদের নামায পুরা কর। আমরা মুসাফির। **(মানাসেকে মোল্লা আলী কারী রহ.)**

মাযহাবের বিভিন্নতায়

বিচলিত ও বিভ্রান্ত না হওয়া চাই

আরবদের মাযহাব ভিন্ন হওয়ার কারণে হজ্জে ৫ দিন দু'রাকাআত পড়েন, চাই মুকীম হোক বা মুসাফির। কিন্তু আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুকীম হলে হজ্জের পাঁচদিন ৪ রাকাআত পূর্ণ পড়তে হবে, দু'রাকাআত পড়লে আদায় হবে না। তাই হক্কানী উলামায়ে কেরামদের থেকে সঠিক মাসআলা জানা ব্যতীত অন্যের দেখা-দেখী বিচলিত হয়ে নতুন আমল শুরু করবেন না।

মিনার বাহিরে তাঁবু

বর্তমানে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে মীনার সীমানার বাহিরে অনেক তাঁবু লাগানো হয়। উযরের কারণে হওয়ার দরুন এইসব তাঁবুতে অবস্থানকারীগণ ইনশাআল্লাহ মীনায় অবস্থানের ফযিলত পাবেন বলে উলামায়ে কেরাম মতামত দিয়েছেন। অবশ্য সম্ভব হলে রাত্রিবেলা মিনার সীমানার ভিতর দিয়ে অবস্থান করতে পারলে একটি সুন্নতের উপর সরাসরি আমল হয়ে যাবে। যদিও সারারাত্রির জন্য না হোক।

০৯ যিলহজ্জ

হজ্জের দ্বিতীয় দিন

আরাফা

যিলহজ্জের নয় তারিখে ইহরাম অবস্থায় আরাফায় হাযিরী হলো হজ্জের মূল রোকন। কোন কারণে এই উকুফ ছুটে গেলে হজ্জই নষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তী কোন বছর অবশ্যই হজ্জ কাযা করতে হবে।

আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

৯ তারিখ সূর্যোদ্বয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়া উত্তম। ফজরের নামায মীনায় পড়ে কিছুটা উচ্চ স্বরে তাকবীরে তাশরীক ও তিনবার তালবিয়া পড়ে সূর্য উঠার পর দু'আ, তাসবীহ, তাহলীল ও তালবিয়া পড়তে পড়তে মুআল্লিমের গাড়ীতে চড়ে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। বর্তমানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শ করে যখন মুনাসিব হয় তখনই যাওয়া উচিৎ। কারণ অনেক সময় গাড়ীর অভাবে আরাফার ময়দানে সঠিক স্থানে পৌঁছা কঠিন হয়ে যায়।

বর্তমানে ভিড়ের কারণে ৮ তারিখ রাতেই আরাফায় চলে যায়। যেহেতু আরাফার তাঁবু খুঁজে বের করা দুস্কর এবং মুআল্লিমের গাড়ী রাতেই ছেড়ে চলে যায়, তাই পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং পরিচিত অভিজ্ঞ সঙ্গী না পেলে সকালে যাওয়ার ঝুঁকি নিবেন না। অনেক কষ্ট ও ঝামেলা হতে পারে। তবে সুস্থ হলে এবং অভিজ্ঞ সঙ্গী পেলে মিনায় ফজর নামায পড়ে রওয়ানা দিতে পারলে উত্তম।

কারণ রাতে রওয়ানা দিলে মিনায় রাত্রি যাপনের সুন্নত, মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সুন্নাত এবং ৯ তারিখ সুর্যোদয়ের পর আরাফায় রওয়ানা হওয়ার মুস্তাহাব আমল ছুটে যায়। এমতাবস্থায় ফজরের পর বাস পেলে ভাল, নতুবা কয়েকজন মিলে সাহস হলে হেঁটে রওয়ানা দিলে সময়মত পৌঁছা যাবে। তবে তখন নিজ কাফেলার তাঁবুতে পৌঁছার আশা করা যাবে না।

তাকবীরে তাশরীক হজ্জের সময়ও ওয়াজিব

তাকবীরে তাশরীফ ৯ তারিখ আরাফার দিন ফজর থেকে ১৩ তারিক আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত নামায যেখানেই পড়বেন, প্রতি ফরয নামাযের পর

একবার তাকবীর পড়া ওয়াজিব (তিন বার পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়)। পুরুষরা সামান্য উঁচু আওয়াজে এবং মহিলারা নিরবে পড়বেন। অনেকেই হজ্জের এই দিনগুলোতে তাকবীরে তাশরীক পড়তে দেখা যায়না।

আরাফার দিন

উম্মতের জন্য বিশেষ রতমতের দিন

'জাবালে রহমতের মাঠে রহমতের মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার দিন। সুতরাং আজ আল্লাহর গোনাহগার বান্দাদের যেমন পরম আনন্দের দিন তেমনি অভিশপ্ত শয়তানের চরম লাঞ্ছনা ও হতাশার দিন। হযরত তালহা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিন শয়তানকে যেমন হীনতা, দীনতা ও তুচ্ছতায় ভারাক্রান্ত এবং ক্রোধান্বিত দেখা গেছে তেমন আর কখনো দেখা যায়নি। এটা শুধু এ কারণে যে, সে আল্লাহর রহমত নাযিল হতে দেখে এবং আল্লাহকে বান্দার বিরাট বিরাট গোনাহ মাফ করে দিতে দেখে; তবে বদরের দিন সে যা দেখেছে সেদিনটি ছাড়া। (অর্থাৎ তার সেদিনের লাঞ্ছনা ও বিপর্যতার অবস্থাও একই রকম)।

হে বন্ধু! সমুদ্রের তুমি কুল পাবে, কিনারা পাবে; সমুদ্রের তলদেশেও খুঁজে পাবে, কিন্তু পাবে না আরাফার ময়দানে আল্লাহর রহমতের কোন কূল-কিনারা, কিংবা তার তলদেশের ঠিকানা।

তুমি যদি এমন অপরাধ করে থাকো যাতে পাহাড় গুঁড়িয়ে যায়, আসমান ভেঙ্গে পড়ে এবং সাগরের পানি কালো হয়ে যায় তবু তুমি গ্রহণ করো রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ। এখানে তোমাকে হাযির করা হয়েছে বঞ্চিত করার জন্য নয়, অনুগ্রহ করার জন্য। জীবনে যার বরবাদি ছাড়া কিছুই নেই, অনুতাপের দু'ফোটা অশ্রু দ্বারা সেও আজ পেয়ে যাবে আল্লাহর রহমতের কোলে আশ্রয়।

আজ তো সেই দিন যেদিন স্বয়ং আল্লাহ নূরের ফিরেশতাদের সামনে বান্দার ইহরামের নূরানিয়াত নিয়ে গর্ব করেন।

মুসলিম শরীফের এ হাদীছ বারবার পড়েছি; আজ হযরতের (হাফেজ্জী হুযুর) যাবানে শুনলাম। শব্দ অভিন্ন, কিন্তু স্বাদ ও প্রসাদ

ছিলো ভিন্ন। তাতে অন্তরে জাগ্রত হলো নতুন ভাব ও ভাবনা এবং নতুন চিন্তা ও চেতনা।

হযরত বললেন, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরাফার দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের যে পরিমাণে জাহান্নাম থেকে আযাদ করেন তেমন অন্য কোন দিন নয়। আর এই দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার খুব নিকটে আসনে, তারপর ফিরিশতাদের মজলিসে বান্দাকে নিয়ে গর্ব করেন, আর বলেন, দেখো, এই পাগল বান্দারা কী চায়!

হযরত আমাদের আরেকটি হাদীস শুনালেন, যা আমার জানা ছিলো না। এ হাদীছ শুনে তো তাঁবুর গোটা মজলিস সুবাহানাল্লাহার আনন্দধ্বনিতে দুলে উঠলো। আর আমার অন্তঃসত্তা আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, পেয়ে গেছি! আমার রাব্বে কারীমের মাগফিরাত আমি পেয়ে গেছি! হযরত বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **সবচে বড় গোনাহগার তো সে, যে আরাফার ময়দানে অকূফ করে, তারপরো ভাবে যে, আল্লাহ হয়তো তাকে মাফ করেনি!**

সুবাহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! ছুম্মা সুবহানাল্লাহ!!! আর কী চাও তুমি হে 'আলহাজ আবদুল্লাহ'! লাব্বাইক বলে হাযির হলে, আর মাগফিরাতের খোশখবর পেয়ে গেলে! তারপর কেন তুমি তাওবা-ইসতিগফার করবে না! কেন দু'আ-মুনাজাত করবে না! কেন কাঁদবে না! কেন হাসবে না! আরাফার তপ্ত বালু কেন আজ তোমার একফোঁটা অশ্রুর সাক্ষী হয়ে থাকবে না! একফোঁটা অশ্রু, অনুতাপের এবং আনন্দের।

আরাফার দিন হলো দু'আ ও মুনাজাতের দিন, দিল খুলে চাওয়ার এবং আঁচলভরে পাওয়ার দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো আরাফার দিনের দু'আ।

হে প্রেমিক! তোমার প্রেমাস্পদের পরম করুণায় জীবনের সুবর্ণসুযোগ এখন তোমার সামনে। সুতরাং আঁচল বিছাও এবং ভিক্ষার পাত্র মেলে ধরো। যা কিছু চাওয়ার চেয়ে নাও এবং চাইতে থাকো; ক্লান্তিহীনভাবে চাইতে থাকো। অন্তরের যা কিছু কামনা-বাসনা, দিলের যা কিছু আরযু ও তামান্না মাওলার দরবারে পেশ করতে থাকো। আজ তো শুধু কবুলিয়াতের দিন! জীবনের এই দুর্লভ সুযোগ যেন অবহেলায় হাতছাড়া না হয়ে যায়।

আরাফার দিনে কীভাবে দু'আ ও মুনাজাত এবং আহাযারি করতে হয়! কীভাবে আবদিয়াত ও বন্দেগি এবং বিনয়কাতরতা ও দাসত্ব নিবেদন করতে হয়! কেনম ছিলো আরাফার ময়দানে আল্লাহর নবীর দু'আ ও রোনাযারি! কেমন ছিলো সাহাবা কেরামের এবং যুগে যুগে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের মুনাজাত ও আহাযারি, তা কিতাবের পাতায় অবশ্যই পড়েছি এবং তাতে আপ্লুত হয়েছি। কিন্তু কিতাবের শুকনো পাতা, আর চোখের ভেজাপাতা তো এক নয়! দু'আ ও মুনাজাতের এবং আহাযারি ও রোনাযরির বর্ণনা, আর যিন্দা নমুনা তো এক নয়! সেই যিন্দা নমুনা আরাফার ময়দানে আল্লাহ আমাদের দেখিয়েছেন হযরত হাফেজ্জি হুযুরের মাঝে।

হযরতের রোনাযারি আমাদেরও হৃদয় স্পর্শ করলো এবং তাতে আমাদেরও হৃদয় বিগলিত হলো। সামান্য একটু হলেও আমাদের ও চোখের পাতা ভিজে উঠলো। আমীন, আমীন বলে আমরাও শামিল হয়ে গেলাম যুগে যুগে আরাফার ময়দানে আল্লাহর পেয়ারা বান্দাদের আহাযারি ও রোনাযারির জামাআতে!

তাঁবুর বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এবং তপ্ত বালুর উপর দাঁড়িয়ে হযরতের মুনাজাত চলতে তো চলছে! 'নিষ্পাপ' দু'টি চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে তো ঝরছে! চোখের অশ্রুবর্ষণ যত বাড়ছে রহমাতের বারিবর্ষণ তত যেন মুষলধারে চলছে! মুনাজাতের বিলাপ যেন থামবে না, রহমাতের বারিধারাও বন্ধ হবে না! দিতে থাকো হে আল্লাহ! বান্দার যোগ্যতার মাপে নয়, দিতে থাকো তোমার রহমতের শানে! আমাদের আঁচল ভরে, পাত্র উপচে পড়বে; নিতে নিতে আমরা ক্লান্ত হয়ে যাবো, তবু তোমার দেয়া থামবে না, দানে তুমি তো কখনো ক্লান্ত হও না!

সময়ের অনুভূতি কারো ছিলো না! আমরা নিমগ্ন ছিলাম, সমর্পিত ছিলাম এবং বিভোর ছিলাম প্রার্থনার মাধুর্যে এবং প্রাপ্তির তৃপ্তিতে। আমরা ডুবে ছিলাম মুনাজাতের মাস্তিতে এবং কবুলিয়াতের শান্তিতে।

আল্লাহর নবীর হজ্জ দেখেছেন সাহাবা কেরাম। তাঁরা যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তার পূর্ণ বিবরণ রেখে গেছেন পরবর্তীদের জন্য, আমাদের জন্য। তাঁরা বলেছেন-যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি রওয়ানা হলেন। বাতনুল ওয়াদিতে উপস্থিত হয়ে উটনীর উপর সওয়ার অবস্থায় লোকদের উদ্দেশ্যে এক মহান খুতবা দান করলেন। তারপর বিলালকে আদেশ করলেন, আর বিলাল আযান দিলেন।

অনন্তর তিনি দু'রাকাআত যোহর এবং দু'রাকআত আছর আদায় করলেন। একত্রিত উভয় নামায থেকে ফারিগ হয়ে তিনি কাছওয়া উটনীতে আরোহণ করলেন এবং মাওকিফে তাশরীফ আনলেন এবং কিবলামুখী হয়ে অকূফ করলেন। তাঁর মাওকিফ বা অবস্থানক্ষেত্র ছিলো জাবালে রাহমাতের পাদদেশে প্রস্তরখন্ডগুলোর নিকটে। অকূফের সময় তিনি দু'আ মুনাজাত ও রোনাযারিতে নিমগ্ন ছিলেন।

কী কী দু'আ তিনি করেছেন মাওলার দরবারে, তার বিশদ বিবরণ এসেছে সাহাবা কেরামের যবানে। আল্লাহর নবী সেদিন তাঁর উম্মতের সমস্ত গোনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের দু'আ করেছেন এবং আল্লাহ তা কবুল করেছেন, কিন্তু যালিমের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কবুল করেননি। কেউ যদি কারো উপর যুলুম করে, কেউ যদি কারো হক নষ্ট করে, তা মাফ হবে না যতক্ষণ না মাযলূম নিজে তা মাফ করে দেয়। কিন্তু উম্মতের দরদে দরদী নবী কি উম্মতের পূর্ণ মাগফিরাত ছাড়া শান্তি পেতে পারেন! আর আল্লাহ তা'আলা কি পারেন তাঁর পেয়ারা হাবীবের আবদার রক্ষা না করে!

মুযদালিফার রাতে আল্লাহর নবী আবার দু'আ করলেন। আল্লাহর কাছে তিনি এই বলে আবদার জানালেন, আয় রাব্ব, আপনি তো মাযলূমকে আপনার পক্ষ হতে খুশী করে যালিমকে মাফ করে দিতে পারেন! উম্মতের জন্য পেয়ারা হাবীবের কত পেয়ারা আবদার! এমনকি যালিম উম্মতির জন্যও ছিলো তাঁর কত দরদ ব্যাথা! অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পেয়ারা হাবীবের এ দু'আও কবুল করলেন এবং বললেন, আপনি শান্ত হোন হে নবী! আপনি আনন্দিত হোন হে রাসূল! আপনার উম্মতের যালিমকেও আমি মাফ করে দেবো (যদি সে অনুতপ্ত হয়ে মাফ চায়), আর মাযলূমকে আমি নিজের পক্ষ হতে খুশী করে দোবা।

এই আরাফার ময়দানে আল্লাহর হাবীব উম্মতের কাঁধে দ্বীনের আমানত রেখে গেছেন। আজ আরাফার ময়দানে হাযির হয়ে তুমিও এই নবুওয়তি আমানতের 'হামিল' হয়ে গেছো। সুতরাং এখান থেকে এই 'আযম' নিয়ে রওয়ানা হও যে, তোমার যিন্দেগী তুমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দেবে। তা না হলে হজ্জ হয়ে যাবে শুধু রসমি হজ্জ। (বাইতুল্লাহর মুসাফির)

হজ্জের প্রধান রুকন বা ফরয

৯ যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে অবস্থান

৯ যিলহাজ্জ দুপুর থেকে ১০ যিলহাজ্জ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু সময়ের জন্য হলেও আরাফার ময়দানে অবস্থান ফরয। এ দিনটি হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায়ের দিন। যোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এ কয়েক ঘন্টা হজ্জের মূল মগজ। এ সময়গুলো কোন অবস্থাতেই যেন গাফলতে না কাটে। দিলকে পরিপূর্ণ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে দু'আ, মুনাজাত, কান্নাকাটি ও যিকর আযকারে মশগুলো থাকুন।

কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে পৌঁছতে না পারে, দিবাগত রাত্রে সুবহে সাদিকের পূর্ব কিছু সময়ের জন্য হলেও আরাফায় পৌঁছলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে এর কারণে দম ওয়াজিব হবে না। কিন্তু অনেক রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। **গুনইয়াতুন্নাসিক ১৫৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯**

আরাফার যে স্থান উকূফযোগ্য নয়

মসজিদে নামিবার পশ্চিমের কিছু অংশসহ বাহিরের স্থানকে বাতনে উ'রনা বলা হয়, যেখানে লাল চিহ্ন দেওয়া আছে। এখানে উকূফ করলে আদায় হবে না। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২২৯)**

উকূফের পূর্বে গোসল করা

যোহরের আগে সম্ভব হলে গোসল করা সুন্নাত। **(গুনইয়াতুন্নসিক ১৪৮)** ওযু করলেও চলবে। স্বাভাবিক পর্যায়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে এ দিনটি পূর্ণ ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিবেন। জাবালে রহমাতের নিকটে অবস্থান করা উত্তম। তবে বর্তমানে নিজ তাঁবুতে অবস্থান করা শ্রেয়। এতবড় ময়দানে একবার পথ ভুলে গেলে পুরাতন লোকেরাও দিশেহারা হয়ে যান। এজন্য দূরে ঘুরাফিরা না করে নিজ তাঁবুতে থাকা উচিৎ।

আরফার দিন জাবালে রহমতে আরোহন করা নিষেধ

অনেকে এদিন জাবালে রহমতে আরোহনের চেষ্টা করেন। ইহা সুন্নাতের খেলাফ আমল।

যোহর ও আসর একত্রে পড়ার শর্ত

আরাফার দিন যোহর ও আসর মসজিদে নামিরায় একসাতে জামাআতের সাথে একত্রীকরণের শর্ত পাওয়া গেলে একত্রে পড়া উত্তম। আরাফায় যোহর আসর একত্রে পড়ার শর্ত তিনটি-

১। ইহরাম থাকা

২। আরাফার ময়দানে থাকা

৩। হজ্জের ইমামের পিছনে পড়া।

অতএব, যারা মসজিদে নামীরাতে জামাআতের সাথে নামায পড়বেন, তারা যোহর আসর একত্রে পড়বেন। তবে তিনি যদি মুকীম হন অর্থাৎ ১৫ দিন হয়ে যায়, তাহলে ইমাম সাহেব দু'রাকাআত পড়ে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকী দুই রাকাআত পড়ে নিতে হবে।
(মানাসেকে মোল্লা আলী কারী-২৭৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৪৯৬

মনে রাখবেন, ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর এই দুই রাকাআত আদায় করার সময় দাঁড়িয়ে কেরাত পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, তিনি ইমামের নামাযের শুরু এবং শেষ পেয়েছেন। **(লাহেক মুক্তাদী)**

তবে এখন মসজিদে নামিরাতে রামায পড়া আমাদের দেশের লোকদের জন্য একরকম সম্ভব হয় না। এশিয়ার তাঁবু মসজিদে নামিরা থেকে অনেক দূরে। তাই যোহরের ওয়াক্ত হলে আযান ও ইকামতের সাথে যোহরের নামায পড়ে নিবেন। এরপর আসরের ওয়াক্ত হলে আযান ও ইকামতের সাথে আসর পড়ে নিন। যারা মুকীম অর্থাৎ যাদের মক্কা শরীফ অবস্থান সহ এদিন পর্যন্ত ১৫ দিন হয়ে গেছে, তারা পূর্ণ নামায পড়বেন। আর যাদের এদিন পর্যন্ত ১৫ দিন না হয়, তারা দুই রাকাআত কসর পড়বেন।

কেহ তাঁবুতে যোহর আসর একত্রে পড়ার কথা বললে তার অনুসরণ করবেন না এবং তার সাথে বিতর্কেও জড়াবেন না। আরাফায় হজ্জের ইমামের ইকতেদা ব্যতীত যোহর আসর একত্রে আদায় জায়েয হওয়ার প্রমাণ নেই।
(শামী : ২/৫০৪-৫০৫; শরহুল লুবাব : ১৯১; আলমগিরী : ১/২২৮)

আরাফার ময়দানে জুমার নামায

আরাফার ময়দানে জুমআ জায়েয নেই, তাই শুক্রবার হলে যোহর পড়বেন।
(সুনানে আবি দাউদ ১/২৬৫ মানাসিক ১৯৬, গুনইয়াতুন্নাসিক ১৫১)

আরাফার দিনের আমল

আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে বিশেষ কোন দু'আ বা যিকর করা জরুরী নয়। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহু আকবার, অন্যান্য যিকর, তিলাওয়াত, দরুদ শরীফ, কালিমায়ে তায়্যিবা, তালবিয়া, তাওবা ইস্তেগফারে সময়গুলো যেন ব্যয় হয়। অনর্থক সময় যেন নষ্ট না হয়। উত্তম হল, আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করা। সম্ভব হলে নিকটের ছোট বা উঁচু স্থানে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করবেন। তা সম্ভব না হলে কিছু সময় পরপর দাঁড়িয়ে দু'আ করবেন।

খুব কাকুতি-মিনতির সহিত নিজের জন্য, বিশ্ব মুসলিমের জন্য, দেশের জন্য, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতদের ও বন্ধু-বান্ধব সকল মুসলমানের জন্য (মনে থাকলে এ বইয়ের লেখক ও প্রচারকের জন্য) ক্রন্দন করে করে দু'আ করবেন। এ দিনটি দু'আ কবুল ও গুনাহ ক্ষমা করানোর সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ। দু'আ কবুল হওয়ার বুক ভরা পূর্ণ আশা নিয়ে দু'আ করবেন। যতবড় গুনাহগার হোক না কেন, আল্লাহ পাক তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী রাহমানুর রাহীম। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

> আরাফার দিন আল্লাহ্ পাক হাজী সাহেবদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন- আমার বান্দা-বান্দীগণের দিকে দেখ, তারা এলোমেলো চুলে, ধূলায় মিশ্রিত অবস্থায় আমার নিকট দূর দূরান্ত থেকে এসেছে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি-তাদের সকলকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা তখন বলবে-হে প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দাকে তো বড় গুনাহগার ধারণা করা হয় এবং অমুক পুরুষ-স্ত্রীকেও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন যে, আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলাম। এ দূর্লভ মূহুর্ত সকলের জীবনে বার বার আসে না। তাই যিকর ও দু'আয় কোন ত্রুটি করবেন না।
>
> হাদীস শরীফ ও আছারে আরাফার ময়দানে কিছু দু'আ ও যিকির বর্ণিত আছে, সম্ভব হলে এগুলো আমল করতে পারলে ভাল।

০১. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আরাফার উত্তম দুআ যা আমি করেছি এবং পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ

লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহু, লা-শারী-কালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আ'লা- কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।

এ দিনের বিশেষ আমল

এক রেওয়াতে বর্ণিত যে, যখন কোন মুসলমান আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর নির্ধারিত কোন স্থানে অবস্থান করে ক্বিবলামূখী হয়ে উপরোক্ত দু'আটি ১০০ বার পড়ে, তারপর ১০০ বার সূরায়ে ইখলাস, এর পর নিম্নে লিখিত দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَعَلي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وعَلي آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ

১০০ বার পাঠ করে, তখন রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের বলেন-হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার এ বান্দার কি প্রতিদান হতে পারে? যে বান্দা আমার তাসবীহ, তাহলীল ও তামজীদ বর্ণনা করেছে, আমার হামদ ও সানা পাঠ করেছে এবং হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করেছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম ও তার নিজের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করলাম। আর আমার বান্দা যদি সমস্ত আরাফায় অবস্থানকারীদের জন্যও সুপারিশ করে তাহলেও তা কবুল করব। (মাসায়েলে হজ্জ ও উমরা- মাও: সাঈদ আহমদ পালনপুরী)

০২. যোহর ও আসরের পর ৩বার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ পড়ে নিম্নোক্ত দু'আটি বর্ণিত আছে-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَـــــى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدَى ونَقِّنِيْ بِالتَّقْوَي وَ اغْفِرْلِيْ فِيْ الآخِرَةِ وَالْأُولَى.

০৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ দু'আটি বর্ণিত আছে। হযরত আলী রা. এ দু'আটি বেশী বেশী পড়তেন-

اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآبِي ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الأَمْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ

০৪. সম্ভব হলে এ দু'আটিও পড়তে পারেন-

اللهم اجعلْ في قلبي نورًا ، و في سمعي نورًا ، اللَّهمَّ اشرَحْ لي صَدْري، ويسِّرْ لي أمري، وأعوذُ بكَ مِن وَسْواسِ الصَّدرِ، وشَتاتِ الأمرِ، وفتنةِ القبرِ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن شرِّ ما يلِجُ في اللَّيلِ، وشرِّ ما يلِجُ في النَّهارِ، وشرِّ ما تهُبُّ به الرِّياحُ

(মুসান্নাফে ইবনে আবি মাইবা হাদীস নং ৩০২৮২, ৩০৭৭২, আলকিরা ৩৯৮)

এছাড়াও যেসব দু'আ আরবীতে মুখস্থ আছে এবং নিজের মনের কথা যে ভাষায় হোক, খুব দু'আ করতে থাকুন।

সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বের না হওয়া

অনেকে সূর্যাস্তের আগে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান, এরূপ হয়ে গেলে অবশ্যই পুনরায় আরাফায় ফিরে আসা জরুরী। যদি ফিরে না আসে, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। **(রদ্দুল মুহতার ২/৫০৩)**

আরাফার দিন দুপুর থেকেই বাসে উঠে যাওয়া

অনেকে যোহরের কিছু পরেই বা আসরের সময় বাসে উঠে মাগরিব পর্যন্ত বসে থাকেন। যার দরুন হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সময়টি বাসে সিট গ্রহণের প্রতিযোগিতা ও কথা বার্তায় কেটে যায়। যা অত্যান্ত আফসোসের বিষয়। এমন মুহূর্ত আরেকবার পাওয়া নসীবের বিষয়। যদিও আরাফা থেকে মুযদালিফায় পৌঁছাতে বাস না পেলে সীমাহীন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং বর্তমানে অনেক সুব্যবস্থার মধ্যেও বাসের এই স্বল্পতায় ইবাদতে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়। তাই উভয় দিক বিবেচনা করে ট্রাভেলসের লোকদের সাথে ভালোভাবে আলোচনা করে নিবেন, যাতে গাড়ী পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা না হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এই দিনটি আমল ও দুআর মধ্যে কাটানো যায়। আর যদি বৃদ্ধ না হন এবং সাথে মহিলা না থাকে তাহলে আসরের পর শেষ মুহূর্তগুলো দুআ ও কান্নাকাটির মধ্যে মাশগুল থাকুন। সাহস করে সূর্যাস্তের পর পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুদালিফায় পৌঁছা সম্ভব। আর ইহাই সবেচেয়ে সহজ ও উত্তম হবে।

মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা

মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)

৯ তারিখ সূর্যাস্তের পর আরাফার ময়দান থেকে মাগরিব নামায না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাহর ময়দান ত্যাগ করবেন না। নতুবা দম ওয়াজিব হবে।

মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে

মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া ওয়াজিব। এক আযান ও ইকামতে প্রথম মাগরিবের ফরয পড়ে একবার তাকবীরে তাশরীক এবং তিনবার তালবিয়া পড়ে ইকামত ব্যতীত ইশার ফরয পড়বেন। ফরয পড়ার পর একবার তাকবীরে তাশরীক ও তিনবার তালবিয়া পড়বেন। তারপর প্রথমে মাগরিবের সুন্নাত, এরপর ইশার সুন্নাত ও বিতির পড়ে নিবেন। জামাত ব্যতীত একাকী নামায পড়লেও এভাবেই পড়বেন। ইশার জন্য ইকামতের কথাও হাদীসে পাওয়া যায়।

(ই'লাউসসুনান : ১০/১২৩-১২৫)

তবে দুই নামাযের মাঝে অন্য কাজে লিপ্ত হলে ইশার জন্য ভিন্ন ইকামাত দিতে হবে।

মুযদালিফার রাস্তায় যদি মাগরিব এশা ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়

মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বেই যদি রাস্তায় এশার ওয়াক্ত হওয়ার কারণে প্রথমে এশা পড়ে ফেলেন তাহলে মুযদালিফায় পৌঁছে পুনরায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতে হবে। এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে যদি কেহ মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করে ফেলে, তাহলে মুযদালিফায় গিয়ে এশার ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় মাগরিব এশা পড়তে হবে। তবে যদি মুযদালিফার সীমানায় পৌঁছার পূর্বে ইশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে রাস্তায় মাগরিব এশা পড়ে নিবেন। কোন ভাবেই যেন মাগরিব ইশা রাস্তায় কাযা না হয়। অন্যথায় এই দু ওয়াক্ত নামায কাযা করার গুনাহ হবে। এরপর যদি মুযদালিফায় পৌঁছার পর এশার ওয়াক্ত পাওয়া যায় তাহলে পূনরায় মাগরিব এশা পড়তে হবে। **(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪০৪, আলবাহরুররায়েক ২/৩৪১)**

কোন কারণে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে

বিশেষ ওজর ব্যতিত নির্ধারিত সময়ে উকূফে মুযদালিফা না করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ভিড়ের কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুদালিফায় পৌঁছতে না পারলে বা অসুস্থতার দরুন মিনায় বা মক্কা শরীফ চলে গেলে দম ওয়াজিব হবে না। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৩১)**

মুযদালিফার বাইরে অবস্থান করা ও ভোরেই মিনার দিকে রওয়ানা দেয়া

অনেক হাজী সাহেবগণ ৯ তারিখ আরাফা থেকে রওয়ানা হয়ে মুযদালিফার শুরু সীমানা জানা না থাকা এবং কয়েক দিনের ক্লান্তির কারণে রাস্তার পাশে শুয়ে যান, এদের দেখাদেখি অন্যরাও রাস্তার পাশে অবস্থান নিতে থাকেন। এরপর ভোরে উঠে ফজর পড়েই রওয়ানা দিয়ে দেন। অথচ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় অবস্থান করা ওয়াজিব তাই মুযদালিফার সীমানা ভালোভাবে দেখে তার ভিতরেই অবস্থান করা জরুরী।

অনেকেই অন্ধকার থাকতেই রওয়ানা দিয়ে দেন, আবার অনেকেই এ সময় পাথর তালাশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফজরের পর ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই ফজর পড়ে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগী ও দুআতে খুব মাশগুল থাকা চাই। **(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীসঃ ১৩৬২২, ১৩৬২৪; গুনইয়াতুন নাসিক ১৬৮)**

মাগরিব ও ইশার পর সুবহে সাদিক পর্যন্ত মুযদালিফায় উকুফ সুন্নাত। সুবহে সাদিকের পর ফর্সা হওয়া পর্যন্ত কিছু সময় উকূফে মুযদালিফা ওয়াজিব। মুযদালিফায় অবস্থান না করলে দম দিতে হবে। অবশ্য মহিলা এবং বেশী অসুস্থরা অবস্থান করতে সক্ষম না হলে মীনায় ফিরে আসতে পারবেন। দম দিতে হবে না।

এই রাত্রিও অত্যন্ত ফজিলত পূর্ণ। ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিন। সুবহে সাদিক হলেই আযান দিয়ে ফজর নামায পড়ে কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া, তাকবীরে তাশরীক ও দরুদ শরীফ পড়ে হাত উঠিয়ে খুব দু'আ করুন। এরপর আকাশ খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবেন। এই সময় দু'আ খুব কবুল হয়।

এখন মুযদালিফার অকূফ

হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ. বললেন, এখন খুব অল্প সময়, কিন্তু খুব মূল্যবান সময়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার সন্ধ্যায় তাঁর উম্মতের জন্য মাগফিরাতে দু'আ করেছেন। তখন তাঁর দু'আ (এভাবে) কবুল করা হলো যে, আল্লাহ বললেন, আমি উম্মতকে মাফ করে দিলাম, তবে যালিমকে নয়, বরং যালিম থেকে আমি মাযলুমের পক্ষে বদলা নেবো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করলেন, আয় রাব্ব! আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে মাযলূমকে জান্নাত থেকে দান করে যালিমকে মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু আরাফার সন্ধ্যায় তাঁর এ আবদার কবুল হয়নি। যখন মুযদালিফায় 'সোবাহ' যাপন করলেন তখন তিনি সেই দু'আর পুনরাবৃত্তি করলেন এবং একসময় হেসে দিলেন! আবু বকর এবং ওমর রা. তা দেখে আরয করলেন, আপনার প্রতি আমাদের আব্বা-আম্মা কোরবান, এ তো এমন মুহূর্ত যখন আপনার হাসবার কথা নয়! তাহলে আপনার হাসির রহস্য কী! আপনার দন্তকে আল্লাহ হাস্যোজ্জল রাখুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেন, আল্লাহর দুশমন (শয়তান) যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন এবং আমার উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন তকন সে মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো এবং নিজের মওত ও বরবাদি চাইতে লাগলো, আর তার বিলাপ দেখে আমার হাসি পেয়ে গেলো।

হযরত বললেন, মুযদালিফার অকূফ এমনই বরকতপূর্ণ যে, এর উসিলায় আল্লাহ তা'আলা উম্মতের জালিমদেরও মাফ করেছেন। **আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে জীবনে কখনো কারো উপর যুলুম করেনি এবং কারো কোন হক নষ্ট করেনি! সুতরাং এই মওকাকে গণীমত মনে করতে হবে এবং সারা জীবনের সমস্ত যুলুম থেকে আজ আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত চাইতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে, বাকি জীবনে জেনেশুনে কারো উপর যুলুম করবো না।** আর অতীতে বান্দার কোন হক নষ্ট করার কথা যদি জানা থাকে তাহলে তার প্রতিকারের চেস্টা অবশ্যই করবো, অন্তত মাযলূম থেকে মাফ নেয়ার চেষ্টা করবো।

এক বুজুর্গ নয় তারিখের রাতে মিনায় স্বপ্ন দেখেন; দু'জন ফিরিশতা, একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছেন, এবার কত মানুষ হজ্জ করতে

মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)

৯ তারিখ সূর্যাস্তের পর আরাফার ময়দান থেকে মাগরিব নামায না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাহর ময়দান ত্যাগ করবেন না। নতুবা দম ওয়াজিব হবে।

মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে

মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া ওয়াজিব। এক আযান ও ইকামতে প্রথম মাগরিবের ফরয পড়ে একবার তাকবীরে তাশরীক এবং তিনবার তালবিয়া পড়ে ইকামত ব্যতীত ইশার ফরয পড়বেন। ফরয পড়ার পর একবার তাকবীরে তাশরীক ও তিনবার তালবিয়া পড়বেন। তারপর প্রথমে মাগরিবের সুন্নাত, এরপর ইশার সুন্নাত ও বিতির পড়ে নিবেন। জামাত ব্যতীত একাকী নামায পড়লেও এভাবেই পড়বেন। ইশার জন্য ইকামতের কথাও হাদীসে পাওয়া যায়।

(ইলাউসসুনান : ১০/১২৩-১২৫)

তবে দুই নামাযের মাঝে অন্য কাজে লিপ্ত হলে ইশার জন্য ভিন্ন ইকামাত দিতে হবে।

মুযদালিফার রাস্তায় যদি মাগরিব এশা ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়

মুযদালিফায় পৌঁছার পূর্বেই যদি রাস্তায় এশার ওয়াক্ত হওয়ার কারণে প্রথমে এশা পড়ে ফেলেন তাহলে মুযদালিফায় পৌঁছে পুনরায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতে হবে। এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে যদি কেহ মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করে ফেলে, তাহলে মুযদালিফায় গিয়ে এশার ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় মাগরিব এশা পড়তে হবে। তবে যদি মুযদালিফার সীমানায় পৌঁছার পূর্বে ইশার ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে রাস্তায় মাগরিব এশা পড়ে নিবেন। কোন ভাবেই যেন মাগরিব ইশা রাস্তায় কাযা না হয়। অন্যথায় এই দু ওয়াক্ত নামায কাযা করার গুনাহ হবে। এরপর যদি মুযদালিফায় পৌঁছার পর এশার ওয়াক্ত পাওয়া যায় তাহলে পূনরায় মাগরিব এশা পড়তে হবে। **(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৪০৪, আলবাহরুররায়েক ২/৩৪১)**

কোন কারণে মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে

বিশেষ ওজর ব্যতিত নির্ধারিত সময়ে উকূফে মুযদালিফা না করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ভিড়ের কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুদালিফায় পৌঁছতে না পারলে বা অসুস্থতার দরুন মিনায় বা মক্কা শরীফ চলে গেলে দম ওয়াজিব হবে না। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৩১)**

কংকর নিক্ষেপ

কংকর সংগ্রহ

জামারাতে তিনদিন কংকর নিক্ষেপের জন্য ৪৯টি এবং চতুর্থ দিনে রমী করতে চাইলে আরো ২১ টি মোট ৭০টি কঙ্কর, যা খেজুর বিচি বা চনাবুটের সমান হয়, ইশার নামাযের পর সংগ্রহ করে নিন। অবশ্য কংকর নিক্ষেপের স্থান ব্যতিত অন্য যে কোন স্থান থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে প্রয়োজনীয় কংকর মুযদালিফা থেকে রাতের ভিতরে সংগ্রহ করাই শ্রেয়। কংকরগুলো ধুয়ে নিলে ভাল।

কংকর কিভাবে নিক্ষেপ করবে

শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গলী দ্বারা কংকর ধরে নিক্ষেপ করুন। কংকর বেষ্টনীর ভিতরে পড়া জরুরী। পিলারে লেগে যদি বাহিরে পড়ে অথবা এক সাথে একাধিক কংকর নিক্ষেপ করে, তাহলে পূণরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। যদি ঐ দিন পূনরায় কংকর নিক্ষেপ না করেন তাহলে দম ওয়াজিব হবে।

১০ যিলহজ্জ : হজ্জের ৩য় দিন

এ দিনের প্রথম কাজ কংকর নিক্ষেপ

হজ্জের তৃতীয় দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে উকূফে মুযদালিফা শেষ করে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। রাস্তায় দুআ যিকর ও তালবিয়া পড়তে পড়তে মীনার নিজ তাঁবুতে ফিরে আসবেন। মিনা পৌঁছে প্রথমে তাঁবুতে সামানা রেখে নিন।মুযদালিফা থেকে সরাসরি জামারাতে এসে কংকর নিক্ষেপ করে সম্ভব হলে মক্কা শরীফে গিয়ে ফরয তাওয়াফে যিয়ারত করতে পারলে ভালো। এরপর দ্রুত তাবুতে ফিরে আসুন।

এদিন শুধু বড় জামরাতে পুথক পৃথক ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলবেন। হাদিসে বর্ণিত দোআটি পড়লে উত্তম।

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَـــــر رَغْمًا لِلشَّيْطَان ورِضًا للرَّحْمن، اللهُمَّ اجْعَلْه حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا .

উচ্চারণ

বিসমিল্লা-হি আল্ল-হু আকবার রগমান লিশশাইত্ব-ন ওয়া রিদান লিররহমা-ন আল্লা-হুম্মাজআ'লহু হজ্জান মাবরু-রা-ওয়া সা'ইয়াম মাশকূ-রা ওয়া যামবান মাগফূ-রা।

তালবিয়া বন্ধ

প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে এবং হজ্জ শেষ হওয়া পর্যন্ত আর তালবিয়া নেই। অবশ্য যদি হজ্জের পর উমরার নিয়তে নতুন ইহরাম বাঁধেন তখন আবার তালবিয়া পড়বেন।

কংকর নিক্ষেপের সময়

প্রথম দিন ১০ তারিখ কংকর নিক্ষেপের সময় হল-সুবহে সাদিক থেকে আগত রাত্র ১১তারিখ সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

১ম দিন কংকর নিক্ষেপের সুন্নাত সময় হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত। সূর্য হেলে পড়া হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জায়েয ওয়াক্ত। সূর্যাস্তের পর মাকরুহ। অন্যান্য দিন (১১,১২,১৩ তারিখ) সূর্য হেলে পড়ার সময় হইতে সর্যাস্ত পর্যন্ত সুন্নাত ওয়াক্ত। সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মাকরুহ ওয়াক্ত।

১১ ও ১২ সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করলে আদায় হবে না

১০ তারিখ ব্যতিত অন্যান্য দিন সূর্য হেলে যাওয়া (যোহরের) পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করলে আদায় হবেনা। তবে দিনে প্রচন্ড ভিড় হলে অথবা মহিলা, দূর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তিদের রাত্রি বেলায় কংকর নিক্ষেপ করা মাকরুহ নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত উলামায়ে কিরামের ফতওয়া হলো যখনই সুযোগ হয় নিরাপদে রামী করতে যাওয়া। এজন্য দিনের বেলায় ভিড়ের মধ্যে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিশেষ করে মহিলাদের নিয়ে কোন অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে যাওয়া উচিৎ নয়! রাত্রি বেলায় যাওয়াই উত্তম। তবে বর্তমানে জামরাতকে অনেক প্রশস্ত করার কারণে সুস্থ ব্যক্তিদের দিনের বেলায় কংকর নিক্ষেপ করতে কোন অসুবিধা হয় না। কংকর নিক্ষেপের সময় হাত থেকে কংকর পড়ে গেলে কখনো উঠানোর চেষ্টা করবেন না। এখানে আমাদের সামান্য বাড়াবাড়ি ও ভুলের দরুন অনেকের জীবন বিপন্ন হয়।

সাতের অধিক কংকর এবং অন্যবস্তু নিক্ষেপ করা

কংকর নিক্ষেপে আমরা খুব বাড়াবাড়ি ও ভুল করে থাকি। এজন্য এবিষয়টি ভাল ভাবে জেনে রাখা উচিৎ। অনেকে নিশ্চয়তার জন্য সাতের অধিক

কংকর নিক্ষেপ করেন। সাতের অধিক কংকর মারা ঠিক নয়। আবার অনেকে মনে করেন ওই স্তম্ভগুলোই শয়তান। তাই আবেগ ঘৃণায় সেখানে জুতা ও স্যান্ডেল, ছাতা সহ যা কিছু থাকে মারতে থাকেন! জুতা-স্যান্ডেল, ইত্যাদি মারা জায়েয নেই। মনে রাখবেন, স্তম্ভগুলো তো হল কংকর নিক্ষেপের জায়গা নির্ধারণের আলামতমাত্র। তাই কংকর নিক্ষেপের সময় পিলারের প্রতি আবেগ বা ঘৃনা দেখানোর চেয়ে নিজের মন থেকে শয়তানের প্রভাব নিক্ষেপ করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করুন। **(মানাসিক ২৪৮, ২৫০, আদ্দুররুল মুখতার ২/৫১৩, ৫১৪)**

অন্যকে দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করা

প্রত্যেকেই পুরুষ হোক বা মহিলা নিজের কংকর নিজেই মারতে হবে। ওজর ব্যতিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে কংকর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না। পূনরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে নতুবা দম ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে অনেককে দারুন উদাসীনতার পরিচয় দিতে দেখা যায়। হজ্জের মতো এতবড় আমালে অবহেলা করা মোটেই উচিৎ নয়। তবে অধিক ভিড়ের কারণে বা এমন অসুস্থতা যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন না এবং কংকর নিক্ষেপের স্থান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আসা যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন না, এমন ব্যক্তির জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে অন্যের দ্বারা কংকর নিক্ষেপ জায়েয হবে। তবে চেষ্টা করা উচিত হুইল চেয়ার বা তাবু থেকে জামরার নিকটবর্তী স্থানে গাড়িতে যাওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহলে নিজের কংকর নিজেই নিক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন। যেন এতবড় ফযিলত থেকে বঞ্চিত না হই।

যিনি অন্যের পক্ষ থেকে পাথর নিক্ষেপ করবেন– তাঁর জন্য অনুমতি নেয়া জরুরী। তবে অচেতন, পাগল ও ছোট বাচ্চার অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে অভিভাবকগণ কংকর মারতে পারবেন। **(গুনইয়াতুন্নসিক ১৮৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৪)**

কুরবানী ও হলক্ব

১০ যিলহাজ্জ দ্বিতীয় কাজ কুরবানী করা

১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনে ও রাত্রে যে কোন সময় কুরবানী করা যায় (ওয়াজিব) তবে ১০ তারিখ রামীর পূর্বে কূরবানী করলে দম ওয়াজিব হবে।

১০ যিলহাজ্জ তৃতীয় কাজ হলক বা কসর

কূরবানী করার পর মাথা মুন্ডন করবেন, না হয় কমপক্ষে এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল ছেঁটে নিবেন। তবে মাথা মুন্ডানো উত্তম! মহিলাদের চুলের অগ্রভাগে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাঁচি দিয়ে কেটে নিবেন। যদি ভিড়ের দরুন ১০ তারিখ দিনে বা রাতে কুরবানী করতে না পারেন হলক বা কসর করে হালাল হতে পারবেন না। বরং যদি কুরবানী করার পূর্বে হলক বা কসর করে ফেলেন তাহলে দম ওয়াজিব হবে।

মাথার চুল আংশিক হলক বা আংশিক কাঁটা

অনেকে হালাল হওয়ার সময় মাথার চুলের কিছু অংশ হলক করে বা কিছু অংশ কেটে হালাল হয়ে যান। মনে রাখবেন, এভাবে আংশিক কেটে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া যায় না। বরং এভাবে আংশিক কেটে হালাল হওয়ার পূর্বেই কাপ পরিধান করার কারণে জরিমানা ওয়াজিব হতে পারে। এজন্য হালাল হওয়ার সময় পরিপূর্ণ মাথা হলক বা কসর করা চাই। **(মানাসিক ২২৯, রুদ্দুল মুহতার ২/৫১০; গুনইয়াতুন নাসিক ১৭৪)**

হজ্জের কুরবানী ও ঈদের কুরবানী

হজ্জের কুরবানী ও ঈদের কুরবানী এক নয়। কেউ যদি একে ঈদের কুরবানী মনে করে যবেহ করে, তাহলে হজ্জের কুরবানী আলাদাভাবে করতে হবে। যাদের মীনা, মুযদালিফা ও মক্কা শরীফে অবস্থান ১৫ দিন হয়, মুকিম হওয়ার কারনে তাদের জন্য মক্কা শরফি হজ্জের কুরবানী ছাড়া ঈদুল আযহার ভিন্ন কুরবানী করতে হবে। তবে ঈদের কুরবানী দেশে করলেও আদায় হবে। **(রাদ্দুল মুহতার ২/৫১৫)**

হজ্জের কুরবানীর গোস্ত

হজ্জের কুরবানীর গোস্ত ঈদুল আযহার কুরবানীর মতই। নিজেও খেতে পারবেন। তবে জরিমানা হিসাবে দমের কুরবানীর গোস্ত নিজে খেতে পারবেন না। **(রদ্দুল মুহতার ২/৫৩২, মানাসিক ৪০৫)**

হজ্জের কুরবানীর সামর্থ না থাকলে

তামাত্তু ও ক্বিরানকারীর হজ্জের কুরবানী করার সামর্থ না থাকলে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখতে হবে। ৩টি রোযা আরাফার দিন পর্যন্ত শেষ করতে হবে। আর বাকী সাতটি রোযা হজ্জের পর যে কোন সময় রাখলেই চলবে। **(সূরা বাক্বারা)** আরাফার দিনসহ তিনটি রোযা না রাখলে তার জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক কুরবানী করতে না পারলে চুল কেটে হালাল হয়ে যাবেন এবং এর জন্য হেরেমের ভিতরে দুটি কুরবানী করতে হবে। একটি হজ্জের কুরবানী অপরটি কুরবানী না করে চুল কাটার কারণে। **(ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৩৯, আদ্দুররুল মুহতার ২/৫৩৩)**

১০ তারিখে তিনটি কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব

০১. কংকর নিক্ষেপ করা।

০২. কুরবানী করা।

০৩. হলক বা কসর করা।

ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলে দম ওয়াজিব হবে। তাই যতক্ষন পর্যন্ত কুরবানী নিশ্চিত না হয় হালাল হবেন না। এজন্যই কুরবানী নিজেদের লোকদ্বারা করানো উত্তম। কুরবানীর টাকা ব্যাংকে জমা দিলে কুরবানীর পূর্বেই হলক হওয়ার আশংকা থাকে। এ কারনে ব্যাংকে টাকা জমা না দিয়ে নিজেরা কুরবানী করার ব্যবস্থা করা ভাল। তবে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করলে আদায় হয়ে যাবে **(আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৫৫)**

হালাল হওয়ার পূর্বে নিজের বা অন্যের চুল কাটা

ইহরাম অবস্থায় যখন হলক বা কসর ছাড়া সব আমল আদায় হয়ে যায় তখন নিজেই নিজের হলক বা কসর করতে পারবেন এবং অন্যের মাথাও হলক বা কসর করতে পারবেন। এর পূর্বে নিজের বা অন্যের চুল কাটলে দম হওয়াজিব হবে।

হজ্জের কুরবানীর সাথে সন্দেহমূলক আরেকটি দম দেয়া

এখানে একটি মাসআলা ভালভাবে মনে রাখা চাই যে, অনেক হাজী সাহেবই কুরবানীর সাথে আরেকটি দম আদায় করে থাকেন এই নিয়তে যে, কোন ভুল হয়ে থাকতে পারে। এটা ঠিক নয়। মনে রাখবেন নামাযে ভুল না হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহমূলক সিজদায়ে সাহু আদায় করা একটি ভুল। তাই দম ওয়াজিব না হলে সান্ত্বনা মূলক দম দেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন। তবে কুরবানীর সাওয়াবের নিয়তে একাধিক কুরবানী করা উত্তম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে একাধিক কুরবানী করেছেন। এক্ষত্রে এভাবে নিয়ত করতে পারেন যে, যদি দম ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে দম হিসাবে নতুবা মুস্তাহাব কুরবানী হিসাবে।

এহরাম থেকে হালাল হওয়া

হলক বা কছরের পর ইহরামের সব নিষেধ শেষ হয়ে যায়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী সম্ভোগ তাওয়াফে যিয়ারত পর্যন্ত নিষিদ্ধ থাকবে।

এখন জামরার পর লাব্বাইকের ধনি আর নেই। হঠাৎ করে যেন সকল প্রাণ প্রাচুর্য ফুরিয়ে যাওয়ার মত, ছিলো লিবাসুল ইহরামের শুভ্রতাটুকু তাও এখন শেষ হওয়ার পথে।

কি ছিলো ইহরামের হাকীকত এবং কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি তা। ইহরামের হাকীকত তো ছিলো জীবন ও জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইশক ও মুহাব্বতে নিজেকে বিলীন করে দেয়া। বিলীন করে দেয়া অনেক দূরে, আমি কি পেরেছি ইশক ও মুহাব্বাতের সাধারণ কোন মাকাম হাছিল করে হজ্জের শিক্ষা ও দীক্ষা ধারণ করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে। তাহলে কিসের ইহরাম হলো। আরাফাহ মুযদালিফায় কিসের অকূফ হলো। কিসের লাব্বাইক হলো। কিসের হজ্জ হলো। এ মূহুর্তের হযরতের কণ্ঠে (হযরত হাফেজ্জি হুজুর রহ.) উচ্চারিত হলো অন্য রকম সান্ত্বনা।

তিনি বললেন, 'কিছু হয়নি' দিল থেকে তা মনে করতে পারা হাকীকতে কিছু হওয়ার আলামত। মাওলা যাকে কিছু দান করেন তাকেই কিছু না হওয়ার অনুভব দান করেন। জানা অজানা ভুল ত্রুটির জন্য শরমিন্দা হও এবং ইসতেগফার করো, আর আল্লাহর রহমতের কাছে আশা করো যে, তিনি এই টুটাফাটা আমল কবুল করেছেন। ভয় 'করন' চাই, আবার ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আশাও করন

চাই। শুভ ভয় এবং শুধু আশা দুটাই শয়তানের হাতিয়ার। শুধু ভয় দ্বারা শয়তান নিরাশ করে আর শুধু আশা দ্বারা গাফেল করে। দিলে যখন ভয় আশা দুটাই থাকে তখন আল্লাহর দরবারে কবুলিয়াত হাছিল হয়। **(বায়তুল্লাহর মুসাফির)**

তাওয়াফে যিয়ারত (হজ্জের ফরয)

তাওয়াফে যিয়ারত ফরয। ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পর হতে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত করা যায়। তবে ১০ তারিখ করা উত্তম, না হয় যতো আগে সম্ভব করে নেয়া উত্তম। রমী কুরবানী ও চুল কাটার পর এ তাওয়াফ করা সুন্নাত। এর পূর্বেও করা যায়। এ তাওয়াফে ইযতিবা নেই। তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্বামী স্ত্রী সম্বোগ হালাল হয়ে যায়।

হজ্জের সাঈ

যারা ৮ যিলহজ্জের পূর্বে একটি নফল তাওয়াফের সাথে সাঈ করেন নাই, তারা প্রথমে তাওয়াফে যিয়ারতের করবেন এবং এ তাওয়াফে রমলও করবেন। তাওয়াফের পর দুই রাকাআত নামায পড়ে যমযমের পানি পেট ভরে পান করুন। কিছু পানি মাথায়, চেহারা ও শরীরে মুছে নিন। এরপর মন ভরে দু'আ করুন। এরপর সাফা মারওয়ায় পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী সাঈ করবেন।

তাওয়াফে যিয়ারত ও সাঈ ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় না করলে

তাওয়াফে যিয়ারত ১২ তারিখ সূর্যোস্তের আগে আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে। একেবারে ছুটে গেলে হজ্জ পুনরায় করতে হবে। আর যদি সাঈ ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করা না হয়, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঈ করে নিবেন। অবশ্য সাঈ বিলম্ব হওয়ার দরুন দম ওয়াজিব হবে না।

সূর্যাস্তের পূর্বে মহিলারা মাসিক অবস্থায় থাকলে

যদি কোন মহিলা ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকেন, তাহলে পাক হওয়পার পর তাওয়াফে য়িারত করে নিবেন। পবিত্র হওয়া পর্যন্ত ১২ তারিখের পরে হলেও অপেক্ষা করতে হবে। দেশে ফেরার পূর্বে যখনই পাক হবেন, তাওয়াফে যিয়ারত করে নিবেন। এ অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে না। যদি দেশে ফেরা পর্যন্ত পাক না হয় এবং ফ্লাইটের তারিখ বাতিল বা বিলম্ব করা কোন ভাবেই সম্ভব না হয় তাহলে অপরগতার কারণে

অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করে নিবেন। অপবিত্র অবস্থায় তাওয়াফ করার কারণে (উট বা গরু) দম দিতে হবে। এর জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ' ও ইস্তেগফার করে নিবেন। তাওয়াফে যিয়ারত করা ছাড়া দেশে ফিরলে পুনরায় হজ্জ করা ফরয।

মহিলারা হায়েযের কারণে তাওয়াফে যিয়ারত না করে যদি দেশে ফিরে যান, যেহেতু হজ্জের ইহরাম বাধার পর তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে স্বামী স্ত্রী মিলন হালাল হয় না, তাই এমতাবস্থায় যতদিন তাওয়াফ না করবে, দেশে ফিরে আসলেও স্বামীর সাথে মেলামেশা করা জায়েয হবে। (ডাক্তারের পরামর্শে বর্তমান যুগে ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে)।

১১ যিলহজ্জ: হজ্জের চতুর্থ দিন

১১ ও ১২ তারিখ সূর্য হেলে যাওয়ার পর প্রথম ছোট জামরায় তারপর জামরায় উসতা (মেঝো) ও জামরায় আক্বাবায় (বড়) ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করবেন (ওয়াজিব)। প্রত্যেকবার তাকবীর বলবেন।

কংকর নিক্ষেপের পরে দু'আ

প্রথম দুই স্থানে কংকর নিক্ষেপের পর কিবলামুখী হয়ে ভালো ভাবে খুব দু'আ করা উত্তম। এখানেও দুআ কবুল হয়। কিন্তু শেষ জামরাতে (বড়) নিক্ষেপের পর কোন দু'আ নেই। আল্লাহর নবী করেননি, আমরাও করবো না।

'তোমার অন্তরে যদি আকুতি জাগে এখানেও একটু মুনাজাত করার, করো না। কেন করবে না, সে প্রশ্নও করো না। হজ্জ তো প্রশ্ন করার নাম নয়, শুধু আত্মসমর্পণ করার নাম! তুমি কৃতার্থ প্রেমিক, তুমি আনুগত বান্দা। তুমি প্রশ্ন করবে না, শুধু পালন করে যাবে। প্রশ্নই যদি করবে তাহলে তুমি এখানে কেন! এখানে যিনি এসেছিলেন তিনি তো পুত্রের গলায় ছুরি বসিয়েছিলেন কোন প্রশ্ন না করে!

আসলে যুক্তি ও বুদ্ধি সর্বদা প্রেম ও ভক্তির শূন্যস্থান পূরণ করে। কিন্তু বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ তো যুক্তি ও বুদ্ধির ইবাদত চান না, তিনি তো চান আবদিয়াত ও দাসত্বের, প্রেম ও মুহব্বতের এবং আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের ইবাদত। **(বাইতুল্লাহর মুসাফির)**

১২ যিলহজ্ব : হজ্জের পঞ্চম দিন

১২ তারিখেও তিন জামারাতে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। ১৩ যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মক্কায় ফিরা উত্তম। ১২ যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে সুবহে সাদিক এর পূর্বে মীনা থেকে বের না হলে ১৩ তারিখ কংকর নিক্ষেপ করে যেতে হবে। নতুবা দম দিতে হবে।

১২ তারিখ কখন মিনা ত্যাগ করতে হয়

অনেকেই মনে করেন যে, ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই মীনা ত্যাগ করতে হয়। নতুবা দম দিতে হবে। তাড়াতাড়ি মক্কায় ফেরার জন্য ভিড়ের মধ্যে দুপুরের পরপরই অনেক কষ্টে কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন। মূলত: ১৩ তারিখ সুবহে সাদেক পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপ করে মীনা ত্যাগ করলে হবে। তাই ভিড়ে কষ্ট না করে যখন হালকা থাকে, তখন সন্ধ্যার পর হলেও ধীরস্থীরে কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় রওয়ানা দিলে অনেক কষ্ট কমে যাবে।

হজ্জের আমল সম্পন্ন

আলহামদুল্লিাহ! কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও তাওয়াফে যিয়ারত করার পর এখন হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এরপর মক্কায় পৌঁছার পর মীকাতের বাহির থেকে আগত হাজীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া আর কোন ওয়াজিব আমল নেই।

হজ্জ সম্পূর্ণ করার পর মক্কা মুকাররমায় যতদিন অবস্থান করবেন নিজের জন্য গণীমত ও খোশনসীব মনে করে বেশী সময় হারাম শরীফে উপস্থিতি, অধিক হারে নিজের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্য নফল তাওয়াফ করে সাওয়াব পৌঁছাতে থাকুন।

জেনে রাখুন, মক্কা শরীফে অবস্থান কালে তাওয়াফ থেকে উত্তম কোন আমল নেই। ১৩ যিলহজ্জের পর ইচ্ছা করলে নিজের জন্য, পিতা-মাতার ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও মসজিদে আয়েশায় ইহরাম বেঁধে উমরা করতে পারেন। তবে হজ্জের পূর্বে উমরার চেয়ে তাওয়াফ উত্তম।

মক্কা শরীফে অবস্থান কালীন বাকী দিনগুলো বইয়ের শুরুতে **'দৈনন্দিন আমলের রুটিন'** এ উল্লোখিত আমলগুলোর উপর যথাসম্ভব চলতে চেষ্টা করবেন।

বিদায়ী তাওয়াফ

পবিত্র হজ্জ শেষ করার পর মক্কা মুকাররমা থেকে যখন রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন সাধারণ নফল তাওয়াফের মত একটি বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব) করবেন। এ তাওয়াফে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। ইজতেবা, রমল এবং সাঈও নেই।

শেষ বিদায়ের বিচ্ছেদ বেদনা

'এত দিনের তাওয়াফ ছিলো মিলনের আনন্দ। আজকের তাওয়াফে বিচ্ছেদের বেদনা। বিদায়ের তাওয়াফ যে এত কষ্টের তা আগে এমনভাবে বুঝিনি। আল্লাহর ঘর থেকে সত্যি কি আজ আমার বিদায়! এ ঘর তাহলে আর দেখা হবে না আগামীকাল। এই মূলতাযামে আমি আর পারবো না বুক লাগাতে। এই দুয়ারে আমি আর দাড়াবোনা অশ্রু ঝরাতে! এটাকি আমার দূর্ভাগ্য, না এটাই আল্লাহর ঘরের আদব। শুধু এতটুকু মিনতি হে আল্লাহ, যা কিছু ভুল ও বিচ্যুতি সব তুমি মাফ করে দাও।

হে আল্লাহ! এ বিদায় যেন হয় শুধু তোমার ঘর থেকে, তোমার সাঙ্গ থেকে নয়। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সাঙ্গ দান করো চিরকাল, জীবনে এবং মরনে, বিচারের ময়দানে এবং জান্নাতের বাজারে।

এখানে এসেছিলাম কি জন্য? আমি তো এসেছিলাম ঘরের দীদারের মাধ্যমে ঘরের মালিকের মহাদিদারকে স্মরণ করার জন্য। ঘর থেকে তোমার বিদায় না হয় হলো। তিনি তো আছেন তোমার সঙ্গে, তুমি যখন জাগ্রত তখনো, তুমি যখন ঘুমন্ত তখনো। তুমি যখন তাঁকে স্মরণ করো তখনো, তুমি যখন তাঁকে ভুলে যাও তখনো। হারাম শরীফের সর্বত্র বিদায়ের বিষন্ন, দৃষ্টি শেষ বারের মত একবার বুলিয়ে নেয়া যাক। মিলনের প্রথম দৃষ্টি সময় হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে যায় যায়।

এবার আমি তাকাবো বায়তুল্লাহর দিকে, কালো গিলাফের পর্দায় লুকিয়ে থাকা সেই পবিত্র ঘরের, যে ঘরের দিদার ছিলো সারা জীবনের স্বপ্ন, প্রিয় বায়তুল্লাহর প্রতি এখনই হবে আমার বিদায় দৃষ্টি, কিন্তু তার আগে হে ঘরের মালিক, হে আল্লাহ তোমার কাছে আমার মিনতি, এ দেখা যেন না হয় শেষ দেখা, এ বিদায় যেন না হয় শেষ বিদায়। আবার যেন আসা হয়, বারবার যেন আসা হয়।

আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরলো, বায়তুল্লাহকে তার অক্ষম এক মুসাফিরের শেষ অশ্রু নিবেদন। আমি তাকালাম ঝাপসা দৃষ্টিতে আমার প্রিয় বাইতুল্লাহর দিকে, 'শেষ বিদায়ের' আগে আবার দেখার স্বপ্ন নিয়ে যেন একটি স্বপ্নের ইতি হলো আরেকটি স্বপ্নের কলি ফুটিয়ে **(বাইতুল্লাহর মুসাফির)**

বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে বিদায়

তাওয়াফে বিদা করার পর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমে নতুবা অন্য যে কোন স্থানে দু'রাকাআত নামায আদায় করে মুলতাযাম, কাবা শরীফের দরজা, হাতীমের ভিতর, ভিড় না থাকলে হারাম শরীফের যে কোন স্থানে কান্নাকাটি ও বিনীত ভাবে বেদনা নিয়ে খুব দু'আ করুন। যমযমের পানি পান করেও দু'আ করুন। যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার ভাব করুন।

'যদি কান্না না আসে! শুকনো চোখ যদি অশ্রুতে না ভিজে আল্লাহর নবী বলেন, (কাঁদতে যদি না পার কান্নার ভান কর)।' সুবহানাল্লাহ! এর পরও কি আমরা বুঝব না! রাহমান-রাহীম আল্লাহ দিতে চান যে কোন সুযোগে, যে কোন উপায়ে এবং যে কোন বাহানায়! তাইতো রহমতের নবীর মাধ্যমে চাওয়ার এবং পাওয়ার কত কৌশল তিনি শিখিয়েছেন তাঁর বান্দাকে! আল্লাহ যেন বলছেন, আমার নেক বান্দারা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়; আমার আযাবের ভয়ে, আমার রহমতের আশায় অশ্রুর ঝর্ণা বহায়। তোমার তো হে বান্দা, সে তাওফীক হয় না! তোমার বুকে তো কান্না জমে না! তোমার চোখ থেকে তো অশ্রু ঝরে না! শক্ত তোমার দিল, মুরদা তোমার কলব, অনুভূতিহীণ তোমার হৃদয়।

তবু হে বান্দা, তোমাকে আমি দিতে চাই, রহমতের জোয়ারে তোমাকেও আমি ভাসিয়ে দিতে চাই! এক কাজ করো; কাঁদতে পারোনা, তা কান্নার ভাব করো।

কাঁদতে পারে না সবাই, কিন্তু কান্নার ভান কে না করতে পারে? তাতেই আমি খুশি হবো তোমার ভান দেখেই আমার ভান নেমে আসবে। কান্নার ভাব কেউ পছন্দ করে না, আমি করি!

আল্লাহ নবীর এ হাদীস অন্তরে ভাবের অপূর্ব এক তরঙ্গ সৃষ্টি করলো, আশায় আমার বুক ভরে উঠলো। আল্লাহর কাছে আসলের যেমন কদর আছে, তেমনি নকলের সমাদার আছে। আসল-নকল সবই তার পছন্দ, পছন্দ নয় শুধু ভেজাল। **(বাইতুল্লাহর মুসাফির)**

বিদায়ী তাওয়াফের পর হারাম শরীফে প্রবেশ

অনেকে মনে করেন বিদায়ী তাওয়াফের পর পুনরায় হারাম শরীফে যাওয়া যাবে না এবং বাইতুল্লাহ শরীফ দেখা যায় ন। এ ধারণা ঠিক নয়। অবশ্য একেবারে শেষ সময় বিদায়ী তাওয়াফ করা উত্তম। কিন্তু বিদায়ী তাওয়াফ করার পর হারাম শরীফে আর যাওয়া যাবে না এমন নয়, বরং যদি সময় থাকে তাহলে অতিরিক্ত তাওয়াফও করা যাবে। এরপর সম্ভব হলে আবার বিদায়ী তাওয়াফ করে নিবে। না করলেও কোন অসুবিধা নেই। **(বাদাইয়ুস্ সানায়ে, আল বাহরুর রায়েক্ব-৪/৪০৯পৃঃ**

যদি মহিলারা মাসিক অবস্থায় থাকেন তাহলে তাওয়াফে বিদা না করেই রওয়ানা দিয়ে দিবেন। এর জন্য দম ওয়াজিব হবে না। তখন হারাম শরীফে প্রবেশ না করে যে কোন দরজার বাহির থেকে দাঁড়িয়ে খুব কান্না কাটির সাথে আফসোস ও বেদনাসহ কা'বা শরীফ থেকে বিদায় নিন।

হজ্জে তামাত্তু'র ধারাবাহিক বিবরণ

০১. মীকাত থেকে বা মীকাতের আগে কোন স্থান থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। উমরার নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে 'লাব্বাইক' পড়া।

০২. হাজরে আসওয়াদে ইসতিলাম করে তাওয়াফ শুরু করা।

০৩. ইযতিবা ও রমল সহকারে উমরার সাত চক্করের সাথে তাওয়াফ করা। তাওয়াফের পর দু'রাকআত ওয়াজিব নামায আদায় করা।

০৪. তাওয়াফের পর মূলতাযামে সম্ভব হলে দুআ করা।

০৫. যমযমের পানি পান করা।

০৬. সাফা পাহাড়ে যেয়ে দুআ করা ও সাঈর নিয়ত করা।

০৭. সাফা মারওয়ায় সাত চক্করে সাঈ করা। মারওয়া পাহাড়ে সাঈ শেষ করে দুআ করা।

০৮. সাঈর পর মাথা মুড়িয়ে অথবা চুল কেটে উমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়া। মহিলাদের চুলের অগ্রভাগে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কাটা।

০৯. হজ্জের পূর্বে মদিনা মুনাওয়ারায় অথবা উমরা করার পর মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে তাওয়াফ, তেলায়াত, যিকর-আযকার, দুআ, দুরুদ ইত্যাদিতে খুব মাশগুল থাকা।

১০. ৮ই যিলহাজ্জ হজ্জের ইহরাম বাঁধা, মিনায় গমন, যোহর থেকে ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা।

১১. ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া। মসজিদে নামিরায় অবস্থান করলে যোহর ও আছরের নামায যোহরের

ওয়াক্তে ইমামের সঙ্গে আদায় করা। নচেৎ যোহরের নামায যোহরের ওয়াক্তে এবং আসরের নামায আসরের সময় আদায় করা।

১২. আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে অবস্থান করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে খুব কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকা।

১৩. সূর্যাস্তের পর মুদাফিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া। (মুআল্লিমের বাসের অপেক্ষায় না থেকে শক্তি সামর্থ ও মনের সাহস হলে ৫/৬ জন একত্রে পায়ে হেঁটে অথবা নিজ নিজ খরচে গাড়ীর ব্যবস্থা করে মুযদালিফায় গিয়ে মাশআরুল হারামে বড় মসজিদের কাছে অবস্থান নেয়া।

১৪. মুযদালিফায় পৌছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করা। এরপর দুআ দুরুদ ও কান্নাকাটিতে লিপ্ত থাকা। শরীর বেশি ক্লান্ত হলে কিছু সময় ঘুমিয়ে নেওয়া। মুযদালিফা থেকে কমপক্ষে ৭০টি কংকর সংগ্রহ করা।

১৫. ১০ যিলহাজ্জ সুবহে সাদিকের সাথে সাথে ফজরের নামায আদায় করা।

১৬. ফজর পড়ে দুআ ও যিকর আযকারে খুব মশগুল থাকা এবং সূর্যোদয়ের ৫/৬ মিনিট আগে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়া।

১৭. তাঁবুতে পৌছে মালপত্র ও ব্যাগ রেখে জামরাতুল আকাবায় গিয়ে ৭টি কংকর মারা।

১৮. এরপর কুরবানী করা।

১৯. কুরবানীর পর মাথা মুড়ানো অথবা চুল ছাঁটানো।

২০. ১০ তারিখ কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী ও হলক এই তিন কাজ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব।

২১. হলক করে বা চুল কেটে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।

২২. মক্কা মুকরারমায় গিয়ে ১০,১১ ও ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করা।

২৩. তাওয়াফের দু'রাকায়াত ওয়াজিব নামায আদায় করা। যমযমের পানি পান করা।

২৪. সাফা মারওয়ায় সাঈ করা। মসজিদুল হারামে গিয়ে দু'রাকাত শোকরানা নফল নামায আদায় করা। (মুস্তাহাব)

২৫. তাওয়াফে যিয়ারত ও সাঈ শেষ করে মিনায় গিয়ে রাত্রি যাপন করা।

২৬. ১১ যিলহাজ্জ তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা।

২৭. ১২ যিলহাজ্জ তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা। সম্ভব হলে ১৩ যিলহাজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কা শরীফ যাওয়া উত্তম।

২৮. ১২ তারিখ দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে মিনা ত্যাগ না করলে ১৩ যিলহাজ্জ তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। (ওয়াজিব)

২৯. মক্কা শরীফ থেকে শেষ বিদায়ের পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।

ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জের বিবরণ

তামাত্তু হজ্জকারীদের আমল বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল। হজ্জের প্রয়োজনীয় অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রে দেশের নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে জেনে আমল করবেন।

ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জকারীদের জন্যও নিয়ম প্রায় একই। ইহরাম, হলক, তাওয়াফে কুদূম এ সকল ক্ষেত্রে কিছু ব্যবধান আছে। সহজে বোঝার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জের আমলসমূহ পেশ করা হল।

ক্বিরান হজ্জের ধারাবাহিক আমলসমূহ

০১. **ইহরাম বাঁধা (ফরয):** এভাবে নিয়ত করুন 'হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একত্রে উমরাহ ও হজ্জ পালনের নিয়ত করছি। আমার জন্য তা সহজ করুন এবং কবুল করুন'। এরপর পূর্বে বর্ণনা অনুযায়ী ইহরাম বেঁধে নিন। জিদ্দা থেকে মক্কা গেলে মীকাত থেকে বা এর আগেই ইহরাম সম্পন্ন করতে হবে। আর সরাসরি মদীনায় গেলে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

০২. **মক্কা শরীফ প্রবেশ করার পর প্রথমে তাওয়াফে কুদুম (সুন্নত):** ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জকারীরা প্রথমে মক্কা শরীফ প্রবেশ করে এই তাওয়াফ করা সুন্নত এ তাওয়াফের পর ইচ্ছা করলে ভীড়ের কারণে হজ্জের সাঈ করা জায়েয আছে। সাঈ করলে (পুরুষের জন্য) তাওয়াফটি ইজতিবা ও রমলসহ আদায় করতে হবে। আর যদি এই তাওয়াফের পর হজ্জের সাঈ আদায় না করেন তাহলে এ তাওয়াফে ইজতিবা ও রমল করবেন না। যদি হজ্জের সাঈ তাওয়াফে কুদুমের পর না করেন তবে তাওয়াফে যিয়ারতের পরে করুন।

০৩. **উমরার তাওয়াফ পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী সম্পন্ন করা (ফরয) :** তবে তালবিয়া বন্ধ করবেন না। কেননা ক্বিরান হজ্জকারী ইহরামের পর থেকে একেবারে কংকর নিক্ষেপ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকা নিয়ম। তাই যত বেশি সম্ভব তালবিয়া পড়তে থাকুন।

০৪. উমরার সাঈ করা (ওয়াজিব): তবে সাঈর পর হালাল হওয়া যাবে না। কেননা, ক্বিরান হজ্জকারী উমরাহ করার পর হজ্জের আগ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে। এরপর হজ্জের কাজ সম্পন্ন করে ১০ তারিখ কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী ও হলক করে হালাল হবেন।

এরপর ক্বিরানকারীর হজ্জের
সব আমল তামাত্তু হজ্জের মতোই

০৫. ৮ যিলহজ্জ যোহর থেকে ৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া সুন্নত। এ সময় মিনায় অবস্থা করা (সুন্নত)

০৬. ৯ যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মুদালিফায় অবস্থান করা সুন্নত। মুযদালিফা পৌছে মাগরিব ও ইশা একত্রে ইশার সময় আদায় করা ওয়াজিব। আর ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।

০৭. মাথার চুল হলক করা (মুন্ডানো) কিংবা চুল ছোট করা ওয়াজিব।

০৮. তাওয়াফে যিয়ারত করা (ফরয)। এরপর তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে হজ্জের সাঈ না করে থাকলে এখন সাঈ করে নিন।

০৯. ১১ ও ১২ যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করা (ওয়াজিব)

১০. ১৩ যিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম।

১১. মীকাতের বাহির থেকে আগত হাজী সাহেবদের বিদায়ী তাওয়াফ করা (ওয়াজিব)

ইফরাদ হজ্জের ধারাবাহিক বিবরণ

- শুধু হজ্জের নিয়তে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ইহরাম বাঁধা (ফরয)
- মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথমে তাওয়াফে কুদুম করা (সুন্নত)।
- তাওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারাতের পরে সাঈ করা (ওয়াজিব)
- ৮ যিলহজ্জ যোহর থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া এবং মিনায় রাত্রিযাপন করা (সুন্নত)।
- ৯ যিলহজ্জ আরাফায় অবস্থান করা (ফরয)
- ৯ যিলহজ্জ রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করা (সুন্নত) তবে ১০ যিলহজ্জসুবহে সাদিকের পর কিছুসময় অবস্থান করা ওয়াজিব।

- ১০ যিলহজ্জ বড় জামরায় এবং ১১ ও ১২ যিলহজ্জ তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা।
- ইফরাদ হজ্জে যেহেতু কোরবানী ওয়াজিব নয় তাই ১০ তারিখ কংকর নিক্ষেপ করে মাথা হলক বা কসর করে নিতে পারবেন (ওয়াজিব) তবে ইফরাদ পালনকারীর জন্য কোরবানী করা মুস্তাহাব, যা মাথা হলক করার পরও করা জায়েয আছে।
- মীকাতের বাহির থেকে আগত হাজী সাহেবদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা (ওয়াজিব)।

দম বা জরিমানা

অন্যান্য ইবাদতের মত পবিত্র হজ্জ যেহেতু জীবনে বার বার আসেনা, যার কারণে হজ্জ বিষয়ক আলোচনা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের সুযোগ হয় না বিধায় সঠিক ভাবে হজ্জ করা অনেকের নসিব হয় না। হজ্জে এমন এমন ভুল মাসআলার উপর আমল হতে দেখা যায়, যার ব্যাপারে সাধারণ হাজী সাহেবগণ এমনকি অনেক আলেমগণেরও জানা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে জরিমানা ওয়াজিব হয় অথচ হাজী সাহেবের জানা না থাকার কারণে অনেক সময় হজ্জ বাতিল হওয়ার আশংকা থাকে। তাই জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার বিষয় বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে ভালোভাবে জেনে নিবেন। নিম্নে জরিমানা বিষয়ক কিছু মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে-

হজ্জ ও উমরার যে সব কারণে জরিমানা আসে, তা দুই ধরনের

০১. ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, সেগুলো করার কারণে।

০২. হজ্জ উমরার কোন আমল ছুটে যাওয়া, তারতীব অনুযায়ী বা সময়মতো না করার কারণে।

- কিরান হজ্জের ক্ষেত্রে ইহরাম যেহেতু হজ্জ-উমরাহ উভয়টির একত্রে হয় তাই কিছু ত্রুটির কারণে জরিমানা দ্বিগুণ হয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটিই ওয়াজিব হয়। তাই প্রয়োজনের সময় কোন আলেম থেকে ভালভাবে জেনে নিতে হবে। ইচ্ছাকৃত ত্রুটি হোক বা অনিচ্ছাকৃত সর্বক্ষেত্রে নির্ধারিত জরিমানা দিতে হবে।
- উমরা ও হজ্জ পালনে কোন ত্রুটি হলে বা ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেললে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি ছাগল-দুম্বা বা উট গরুর সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী করাকে দম বলে।

- এর কম ক্ষতিপূরণকে সাদকা বলা হয়, যা এক দুই রিয়ালও হতে পারে। আর যে ভুলের কারণে একটি উট বা গরু কোরবানী দিতে হয় তাকে বাদানা বলা হয়। তবে 'দম' ও বাদানা যখনই আদায় করা হোক হেরেমের এলাকায় দেওয়া জরুরী। হেরেমের বাইরে দিলে আদায় হবে না। **(মানাসিক ৩৯২-৩; গুনইয়াতুন নাসিক ২৪০, ২৬২)**

- 'দম' বা সাদকা ওয়াজিব হলে এই হজ্জের মৌসুমে দেওয়া জরুরি নয়। পরে দিলেও চলবে। (রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৩; মানাসিক ৩৮৪) এসব জরিমানা নিজে খাওয়া কিংবা পিতা-মাতা ছেলে সন্তানদেরকে দেওয়া যাবে না। ফকির মিসকীনকে দেওয়া জরুরী।
(মানাসিক মোল্লা আলী কারী ৩৯৫)

- অনেক ভুলের সদকা এমন আছে যা হেরেমের এলাকার ফকীরকে দেওয়া জরুরী নয়। অন্য এলাকার ফকীরকে দিলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে সেখানের ফীকরকে দেওয়া ভালো। (মানাসিক ৩৯৬)

- দেহের আকৃতিতে সেলাইযুক্ত কাপড় ইহরাম অবস্থায় পরিধান করা যেমন-জামা, গেঞ্জি, পায়জামা, প্যান্ট, জাঙ্গিয়া পরা নাজায়েয। যদি কেউ পূর্ণ ১২ ঘন্টা পরে থাকে বা এর বেশি কয়েকদিন হলেও একটি দম ওয়াজিব হবে।

- ১২ ঘন্টার কম অন্তত এক ঘন্টা হলে একটি সদকাতুল ফিতর পরিমাণ ওয়াজিব হবে। ১ ঘন্টার কম হলে সামান্য কিছু ১/২ রিয়াল দিয়ে দিলেও হবে। **(মানাসিক ৩০০-১; রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৭)**
- যয়তুন, তিল, নারিকেল ও সরিষার সুঘ্রাণযুক্ত তেল মাথা বা পূর্ণ বড় অঙ্গে ব্যবহার করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর এক অঙ্গের কম হলে সদকায় ফিতর ওয়াজিব হবে। **(তরীকায়ে হজ্জ ও উমরাহ ১১৩)**

- সুগন্ধি সাবান দ্বারা হাত বা মাথা ধুলে একটি সদকায় ফিতর ওয়াজিব হবে। **(মানাসিক ৩২৩; গুনইয়াতুন নাসিক ২৪৯)**

- পূর্ণ মুখমন্ডল, পূর্ণ মাথা কিংবা এক চতুর্থাংশ ১২ ঘন্টা বা এর বেশি সময় ঢেকে রাখলে দম দিতে হবে। যদি চার ভাগের কম হয় বা ১২ ঘন্টার কম সময় পূর্ণ মুখ বা মাথা ঢাকা থাকে তবে এক সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। **(মানাসিক ৩০৭; রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৭)**

- অযু-গোসলের সময় তেমনিভাবে চুলকাতে গিয়ে যদি ৩টি চুল বা দাড়ি পড়ে যায় তাহলে অল্প কিছু সদকা করে দিলে হবে। আর যদি নিজে টেনে উঠিয়ে ফেলে তাহলে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে অল্প কিছু সদকা করে দিতে হবে। যদি চার বা ততোধিক চুল উঠান, তাহলে একটি সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। **(গুনাইয়াতুন নাসিক ২৫৬; মানাসিক ৩২৭-৮)**

- উমরার তাওয়াফের এক চক্করও যদি বিনা অযুতে করা হয় কিংবা হায়েয, নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করে ফেলে তাহলে কিরানকারী এবং তামত্তুকারী সকলকে একটি দম দিতে হবে। **(গুনইয়াহ ২৭৬; মানাসিক ২৫২; আহকামে হজ্জ ১০৪)**

- পুরো তাওয়াফে যিয়ারত কিংবা এর অধিকাংশ চক্কর বিনা অযুতে করলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি পুরো তাওয়াফে কুদুম, বিদায়ী তাওয়াফ বা নফল তাওয়াফ বিনা অযুতে করে অথবা তাওয়াফ যিয়ারতের তিন বা এর কম চক্কর বিনা অযুতে করে, তাহলে প্রত্যেক চক্করের পরিবর্তে এক সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে অযু করে তা পুনরায় করে নিয়ে জরিমানা দিতে হবে না। **(গুনাইয়াতুন নাসিক ২৭২-৬; মানাসিক ৩৪৬-৭, ৩৫১-২; আহকামে হজ্জ ১০৩)**

- তাওয়াফ জিয়ারত পুরোটা বা অধিক চক্কর হায়েয- নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করলে 'বাদানা' দিতে হবে। অর্থাৎ একটি গরু বা উট কুরবানী করতে হবে। **(গুনইয়াতুন নাসিক ২৭২)**

- আর তাওয়াকে কুদুম, বিদায়ী তাওয়াফ ও নফল তাওয়াফের মধ্যে অধিকাংশ চক্কর হায়েয-নেফাস বা গোসল ফরয অবস্থায় করলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য এ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র অবস্থায় পুনরায় তাওয়াফ করে নিলে জরিমানা দিতে হবে না। **(গুনইয়াতুন নাসিক, ২৭৫, ২৭৬, মানাসিক-৩৫০-৩৫২)**

- দশ তারিখের কংকর নিক্ষেপের পূর্বে হলক বা চুল কাটলে, তেমনিভাবে তামাত্তু ও কিরানকারী কুরবানী করার আগে মাথা মুন্ডালে বা চুল কাটালে দম ওয়াজিব হবে। কুরবানীর জন্য ব্যাংকে টাকা জমা দিলে রশীদে চুল কাটার যে সময় দেওয়া থাকে সে অনুযায়ী চুল কেটে যদিও হালাল হয়ে যাওয়া জায়েযের ফতওয়া দেওয়া হয়েছে, তবে তাদের মাযহাবে যেহেতু কোরবানীর পূর্বে হলক বা চুল কাটলে দম ওয়াজিব হয় না সে জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকতার বিষয়ে তেমন গুরুত্ব প্রদান করার

কথা নয়। তাই নিজেদের জিম্মাদারীতে কোরবানী দিতে পারলে উত্তম। **(মানাসিক ৩৫৮; আহকামে হজ্জ ১০৬)**

- প্রত্যেকেই পুরুষ হোক বা মহিলা নিজের কংকর নিজেই মারতে হবে। ওজর ব্যতিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে কংকর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না। পুনরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে নতুবা দম ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে ভিড়ের ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক মহিলা ভিড়ের ওযরে বা হাঁটার ভয়ে কিংবা সামান্য দূর্বলতার অজুহাতে অন্যকে দিয়ে কংকর মারান। এতে কংকর মারার ওয়াজিব আদায় হবে না। এ সকল ক্ষেত্রে নিজে আবার কংকর মারতে হবে। না করলে একটি দম দিতে হবে।

- তিন দিনের কংকর অথবা এক দিনের পুরো কংকর কিংবা অধিকাংশ কংকর নিক্ষেপ না করে থাকলে একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি দশ তারিখের তিন কংকর বা এর কম এবং ১১ ও ১২ তারিখের দশ কংকর বা এর কম বাদ পড়ে যায় তাহলে প্রত্যেক কংকরের পরিবর্তে পূর্ণ সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে। (মানাসিক ৩৫৮ আহকামে হজ্জ ১০৬; গুনইয়াতুন নাসিক ২৭৯)

যেসব ক্ষেত্রে কোন জরিমানা দিতে হয় না

- হাত দিয়ে চুলকানো ছাড়া যদি নিজে নিজে চুল ঝরে পড়ে, এর কারণে কোন জরিমানা আসবে না। **(গুনইয়াতুন নাসিক ২৫৮; আহকামে হজ্জ ৯৯)**

  নখের আংশিক উঠে গেলে বাকিটা কেটে ফেললে কোন জরিমানা আসবে না। তেমনিভাবে কফি, চা ইত্যাদি পান করা যাবে (আহকামে হজ্জ ৯৬)

- দারুচিনি, গরম মসল্লা খাবারে দেওয়া এবং খাওয়া জায়েয। (যুবদাতুল মানাসিক ৩৫৫-৬; গুনইয়াতুন নাসিক ২৪৭; আহকামে হজ্জ ৯৬) তবে গানের সাথে এলাচি, লং কিংবা সুঘ্রাণযুক্ত মসলা বা জর্দা খাওয়া মাকরুহ। **(আহকামে হজ্জ ৯৩)**

- গরু, বকরি, হাস, মুরগি জবাই করা এবং খাওয়া জায়েয। জরিমানা আসবে না। **(আদ্দুররুল মুখতার ২/৫৭১; আহকামে হজ্জ ১০১।**

- মশা-মাছি, ইদুর, সাপ, টিকটিকি, বিচ্ছু এ ধরনের কষ্টদায়ক প্রাণী মারলে জরিমানা দিতে হবে না। মাছ, কাকড়া মারলে কোন জরিমানা নেই **(গুনইয়াতুন নাসিক ২৭৯; মানাসিক ৩৭৯)**

- স্বপ্নদোষ হলেও কোন জরিমানা আসবে না।

- শরীরে বা কাপড়ে নাপাকি থাকা অবস্থায় তাওয়াফ করলে কোন জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু নাপাকি নিয়ে তাওয়াফ করা মাকরুহ। **(গুনইয়াহ নাসিক ২৭৭; মানাসিক ১৫১)**

- ভিড়ের কারণে ফজরের সময় মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে দম দিতে হবে না। (মানাসিক ২৫৬-৭)

মক্কা শরীফে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

সাফা পাহাড়

মা হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক পাহাড়। এ পাহাড়ে সাঈ করা হয়। এ পাহাড়ের সাথে ইসলামের অনেক স্মৃতি জড়িত। যেমন-

০১. যখন وانذر عشـــــــيرتك الاقربين (আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়স্বজনদের ভয় ভীতি প্রদর্শন করুন) এ আয়াত অবতীর্ণ হয় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফের সব গোত্রকে এ পাহাড়ে একত্রিত করে দাওয়াত দিলেন। আবু লাহাব হুযুরের মুখের উপর আঙ্গুল তুলে বলে দিল, এ জন্য কি আমাদের তুমি একত্রিত করেছিলে? যার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়-আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক-

০২. কুরাইশরা নবী আলাইহিস সালামের নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার শর্তে ঈমান আনার কথা বলল। হযরত জিবরাঈল আ. এসে বললেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ! এরপর যদি তারা ঈমান আনে, তাহলে তো ভালো, অন্যথায় তাদের এমন আযাব দেব, যা কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহর রাসুল তাদের জন্য তাওবা ও রহমতের রাস্তা খোলা রাখার কামনায় তা করেননি। যার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ইসরার ৫৯ নং আয়াত : **'আমি নিদর্শনাবলী পাঠানো এ জন্য বন্ধ রাখি যে, অতীতের লোকেরা তাকে মিথ্যা সাবাস্ত করেছিল'** নাযিল হয়।

০৩. এই পাহাড়ে একবার আবু জাহল আল্লাহর রাসূলকে পাথর মেরে মাথা মোবারকে আঘাত করে প্রতিশোধ নেয়।

০৪. মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল সাফা পাহাড়ে চড়ে ঘোষণা দিলেন, এখানে ইসলামের দাওয়াত আরম্ভ হয়েছিল এবং আমাকে ও মুসলমানদের সবধরণের কষ্ট দেয়া হয়েছিল। আজ ইসলামের এ

বিজয়ের দিনে আমাদের কৃতজ্ঞতা, দুআ' ও নে'য়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

০৫. মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পাহাড়ে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে, নিজ অস্ত্র ফেলে দিবে, যে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিবে, সে নিরাপত্তা পাবে।

০৬. কিয়ামতের একটি প্রধান আলামত হল, কিয়ামতের পূর্বে এক ধরণের প্রাণী বের হবে, যেগুলো মানুষের মত কথা বলবে। এ প্রাণী সাফা পাহাড়, আবু কুবাইস পাহাড় এবং সবচেয়ে বড় মসজিদ থেকে বের হওয়ার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তবে তিন স্থান পাশাপাশি হওয়ার কারণে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীগণ তিন মতামতের মাঝে সামঞ্জস্য পেশ করেন। **(তাফসীরে তাবারি, তাফসীরে ফাতহুল কাদির, ৪/১৫১, সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৫৭)**

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান

মারওয়ার সম্মুখে শিআ'বে আবি তালেবের নিকটে হুযুরের জন্মস্থানের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। যেখানে বর্তমানে 'মাকতাবা মক্কতুল মুকাররমা' নামে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এখানে অনেকেই বাড়াবাড়ি করে চুমু দেন অথবা শরীর লাগিয়ে বরকত মনে করে। এ জাতীয় আমল বিদআত ও গুনাহের কাজ।

শিআবে আবু তালেব বা আবু তালেবের ঘাঁটি

এ ঘাঁটি জাবালে আবু কুবাইসের নিকট মসজিদে হারাম থেকে ৩০০ মি. দূরে। যেখানে কাফেররা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুসলমানসহ এবং তাঁর বংশ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালেবদের তিন বৎসর বয়কট করে রেখেছিল। এ তিন বৎসরের দীর্ঘ বয়কটে অন্তর কাঁপানো ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। যা প্রত্যেক মুসলমানের কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণের উজ্জ্বল নমুনা হতে পারে।

আবু কুবায়েস পাহাড়

মসজিদে হারামের নিকটে সাফা পাহাড়ের সাথে অবস্থিত। এ পাহাড়ে কুরআনে বর্ণিত চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করার ঘটনার উল্লেখ করা হয়। কোন কোন কিতাব উল্লেখ আছে, হাজরে আসওয়াদ আসমান থেকে এনে এ পাহাড়ে চল্লিশ বৎসর রাখা হয়েছিল। **(তাবরানী)** এ পাহাড় পৃথিবীর প্রথম পাহাড় বলে ইতিহাসে উল্লেখিত।

মসজিদে জ্বিন

মসজিদে হারাম থেকে জান্নাতুল মুআল্লাহর পথে অবস্থিত। যেখানে জ্বিনদের একটি বড় দল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. হুযুরের সাথে ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির উপর রেখা টেনে ইবনে আব্বাস রা.কে রেখা অতিক্রম না করার জন্য বলে দিয়েছিলেন।

মসজিদে শাজারা বা গাছের মসজিদ

মসজিদে জ্বিনের বিপরীতে অবস্থিত। মসজিদে জ্বিনের স্থানে দাঁড়িয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছকে ডেকেছিলেন, গাছ মাটি চিড়ে হেঁটে এসেছিল। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম গাছকে চলে যাওয়ার নির্দেংশ দিলেন, গাছ নিজ স্থানে চলে গেল। সে স্থানে এ মসজিদ নির্মিত হয়।

মসজিদে রাহাহ বা পতাকার মসজিদ

মসজিদে জ্বিনের নিকটে অবস্তিত মক্কা বিজয়ের সময় যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু ফেলে পতাকা উত্তোলনের আদেশ দিয়েছিলেন।

দারে নাদওয়া বা সভাকক্ষ

কাবা ঘরের উত্তর পশ্চিম দিকে ছিল যা কুরাইশদের সংসদ ভবন হিসাবে ব্যবহারিত হত। হুযুরের জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে ইবনে কিলাব ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘরে বসেই কাফেররা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মদীনা শরীফে হিজরত করার হুকুম আসে।

মুআল্লা কবরস্থান

মক্কা শরীফের ঐতিহাসিক কবরস্থান যা হারাম শরীফের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এ কবরস্থানের ফযীলত হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়। হযরত খাদীজা রা. সহ অনেক সাহাবায়ে কেরাম এবং অনেক নেককারদের কবর রয়েছে। হাজী সাহেবদের দীর্ঘ সময় নিয়ে মুআল্লা কবরস্থানে যিয়ারতে যাওয়া উচিৎ।

হযরত খুবায়ের রা. এর শাহাদাতের স্থান

মসজিদে তানঈম থেকে উত্তর দিকে আনুমানিক ২০০ মি. পরে। সেখানে একটি মিনার নির্মিত ছিল যা ১৩৭৭ হিঃ পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

জিই'ররানা

মসজিদে হারাম থেকে ২৪ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করেন। বর্তমানে সেকানে ৪৩০ বর্গমিটার আয়তনের একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

হুদায়বিয়া

জিদ্দার পুরাতন রাস্তায় মসজিদে হারাম থেকে ২৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। যেখানে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। জিদ্দা যেতে যেখানে বর্তমানে রাস্তার উপর দিয়ে বড় রেহাল চিহ্নিত রয়েছে।

বাইয়াতে রিদওয়ান

৬ষ্ঠ হিজরীতে এক স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল মদিনা শরীফ থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরদের পক্ষ থেকে বাঁধাগ্রস্ত হন, তখন হযরত উসমান রা. কে হত্যা করা হয়েছে

এমন মিথ্যা সংবাদ শয়তান কর্তৃক প্রচার হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সাহাবাদের হাতে হাত রেখে বায়আত নেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে 'সুরা ফাত্হের' আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

ক্বারণে মানাযিল

মসজিদে হারাম থেকে ৮০ কি. মি. উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত। তায়েফবাসীদের চরম দূর্ব্যবহার ও নির্যাতনের পর যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানে পৌঁছেছিলেন, তখন জিবরাঈল আ. পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে নিয়ে এসে দুই পাহাড়কে তাদের উপর ফেলে দিয়ে পুরো তায়েফবাসীকে একত্রে ধ্বংস করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য হেদায়াত ও মাগফিরাতের দুআ করেছেন।

মসজিদে খায়েফ

ইহা মিনার দক্ষিণে জামারাতে নিকটে অবস্থিত। ফযীলতপূর্ণ মসজিদ, যেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অসংখ্য নবীগণ নামায আদায় করেছেন।

মুরসালাত গুহা

মসজিদে খায়েফের পিছন সংলগ্ন পাহাড়ে অবস্থিত। যেখানে ২৯ পারায় সূরা মুরসালাত নাযিল হয়।

ওয়াদিয়ে মুহাস্সার

মীনা ও মুযদালিফার কাছে অবস্থিত, যেখানে বড় সাইনবোর্ড লাগনো আছে। আবরাহা বাদশার বিশাল হস্তিবাহিনীকে আল্লাহ পাক ছোট ছোট পাখির নিক্ষিপ্ত ছোট পাথর কণা দ্বারা ধ্বংশ করেছিলেন। যারা ক্বাবা শরীফ ধ্বংশ করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে এসেছিল। আযাবের স্থান হিসাবে দ্রুত অতিক্রম করা মুস্তাহাব। **(যাদুল মআ'দ-১/২৭৪)**

মসজিদে নামীরা

আরাফার ময়দানে অবস্থিদ বিশাল মসজিদ। এ মসজিদে সাড়ে তিন লক্ষ নামাযীর অধিক লোক সংকুলান হয়। তবে এ মসজিদের কিছু অংশ আরাফার সীমানার বাহিরে অবস্থিত।

যোবায়দা ঝর্ণা

মসজিদে হারাম থেকে ৩৬ কি.মি. দূরে হুনাইনের নু'মান উপত্যকা থেকে

আরাফাহ উ'রনা দিয়ে অতিক্রম করে মীনা হয়ে মক্কা শরীফ এসে পৌঁছে। যখন মক্কাবাসী পানির ভীষণ সঙ্কটে পড়েন, তখন খলফিা হারুনুর রশিদের স্ত্রী যোবায়দা মক্কাবাসীর এই দূর্ভোগ দেখে নিজ খরচে ৭৯১ খ্রিঃ এ ঝর্ণা চালু করেন। আনুমানিক ১২০০ বৎসর মক্কাবাসী এ পানি পান করেন। এ ঝর্ণার দেয়ালসহ অনেক চিহ্ন এখনো বিদ্যমান আছে। আরাফাহর ময়দানের প্রসিদ্ধ পাহাড় যার নিকটেই যোবায়দা ঝর্ণা।

জাবালে রহমত

এ পাহাড়ের ব্যাপারে অনেকের ধারণা, এ পাহাড়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন। মূলত জাবালে রহমতে ভাষণ দেননি; বরং উরনা উপত্যকায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। উরনা উপত্যকা মসজিদে নামিরার সম্মুখ অংশে অবস্থিত।

সাখরা মসজিদ

আরাফাহর জাবালে রহমতের গা ঘেঁষে ডান দিকে অবস্থিত। আরাফাহর দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামীরাতে জোহর-আসর পড়ে মাগরিব পর্যন্ত স্বীয় উটনীর উপর আরোহন করে এখানে দুআয় রত ছিলেন। এখানে সূরা মায়েদার তিন নং আয়াত

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ

আজকের দিকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।

ইহুদীরা এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ওমর রা.কে বলত যে, এ আয়াত যদি আমাদের নিকট আসত, এ দিনকে আমরা ঈদ বলে ঘোষণা দিতাম।

যিয়ারতে মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সারওয়ারে কায়েনাত, তাজেদারে মদীনা, জনাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা আতহার, যাঁর শাফাআত ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না তাঁর যিয়ারত বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

বায়তুল্লাহার মুসাফির এর লেখক হযরত কত সুন্দর ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন,

'মদীনা থেকে কত হাজার মাইল দূরে আমার জন্মভূমি। এত দিন আমি শুধু স্বপ্ন দেখেছি, আর স্বপ্নের বেদনা বহন করেছি। আজ আমার স্বপ্নের ময়ূর পূর্ণ পেখম মেলেছে। এখন আমি মসজিদে নববীর নূর ও নূরানিয়াতে স্নাত। এখন আমার চোখের দৃষ্টি সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতায় সিক্ত। এ মহাসৌভাগ্য কি আমার প্রাপ্য ছিলো! না, ছিলো না। এ পাক দরবারে তারাই শুধু উপস্থিত হওয়ার এবং দরূদ ও সালামের নাযরানা পেশ করার উপযুক্ত যাদের দেহ, হৃদয় ও আত্মা পবিত্র। যুগে যুগে তারা এখানে হাযির হয়েছেন, সালাম পেশ করেছেন এবং সালামের জবাব পেয়েছেন। যুগে যুগে তারাই এখানে আসবেন, সালাম পেশ করবেন এবং সালামের জবাব পাবেন।

না বন্ধু না! পাপী উম্মতি বলে তুমি নিরাশ হয়ো না! আল্লাহ তো গোনাহগার বান্দারও খালিক, মালিক ও রব্ব। সূর্য যখন উদিত হয় পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাকে আলোকিত করে; মেঘ যখন বৃষ্টি বর্ষণ করে, উষর-উর্বর প্রতিটি ভূমিকে সিঞ্চিত করে। সূর্যের আলো, মেঘের বৃষ্টি, সে তো আল্লাহর সৃষ্টি! তাহলে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি কেন বর্ষিত হবে না তাঁর সকল বান্দার উপর! তাই তো যুগে যুগে

নেককার বান্দারা যেমন লাভ করেছেন আল্লাহর রহমত এবং হাযির হয়েছেন পেয়ারা নবীর পাক রওযায়, তেমনি গোনাহগার বান্দাদেরও আল্লাহ বঞ্চিত করেননি তাঁর রহমত থেকে। তাদেরও তিনি হাযির করেছেন তাঁর পেয়ারা হাবীবের পাক দরবারে।

হে আল্লাহ! সোনার মদীনায় পেয়ারা নবীর রওযায় আমি যে হাযির হতে পেরেছি সে আমার আমলের গুণে নয়, নয় কোন যোগ্যতার বলে। এ শুধু তোমার দয়া ও করুণা। সুতরাং তোমার শোকর হে আল্লাহ! তোমার শোকর!

ভিতরে আমার আবেগের উচ্ছাস, যদিও বাইরে তার নেই কোন প্রকাশ। বসে আছি শান্ত-সংযতভাবে এবং অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সবুজ গম্বুজের পানে, কিন্তু ভিতরের উচ্ছাস এক সময় বের হয়ে এলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে। আমি কাঁদলাম খুশির কান্না! আমার অশ্রু ছিলো শোকরের ও কৃতজ্ঞতার। আল্লাহকে বান্দা আর কী দিতে পারে দু'ফোঁটা অশ্রু ছাড়া! যদিও সামান্য চোখের পানি, তবে আল্লাহর কাছে এর মূল্য অনেকখানি। কান্না, সেও তো আল্লাহর দান! তিনি যদি দয়া না করেন তাহলে তো চোখর নোনা দরিয়ায়ও জোয়ার আসে না! সুতরাং কাঁদো শোকরের কান্না এবং আদায় করো কান্নার শোকর।

অত্যন্ত দূর্ভাগা সেই লোক, যে পরিপূর্ণ সামর্থ থাকা সত্তেও এতবড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে। মদীনা মুনাওওয়ারাহর এতটুকু ফযীলতই যথেষ্ট যে, স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে শায়িত আছেন। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত স্থানের ফযীলত কাবা শরীফ ও আল্লাহ তা'আলার আরশের চেয়েও বেশি।

যিয়ারতে মদীনার যে তৃপ্তি ও প্রশান্তি পাওয়া যায় তা দূর থেকে কখনও কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কারণ রওয়ায়ে আতাহরের সামনে সালাম পেশ করতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মুসলমানদের উৎসাহিত করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-আমার মৃত্যুর পর যে আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল। যদিও যিয়ারত হজ্জের কোন অংশ নয় তবে সামর্থবান আশে মুসলমান হজ্জ বা শুধু উমরার সফরে এই নিয়ামত ও সৌভাগ্য থেকে বিরত থাকতে পারে না। **(বাইতুল্লাহর মুসাফির)**

তবে একটি বিষয় ভালভাবে বুঝা দুরকার যে, মুখে মুখে ইশক ও মুহাব্বতের দাবী করলে চলবেনা বরং সত্যিকার অর্থে মুহাব্বত ও সম্মান প্রদর্শন তখনই হবে যখন আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে নিজেদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করব। রওযা মুবারকে যাওয়ার পূর্বে কমপক্ষে এতটুকু চিন্তা করা উচিত যে, আমি অধম সালাম পেশ করার পর আমার বাহ্যিক সূরত ও আমলের কারণে যেন নবীজির চেহারা মুবারক মলিন না হয়ে যায়।

উসওযায় হান্নানার ঘটনা আমরা জানি, যে গাছের ডালায় হাত রেখে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করতেন। যখন মিম্বর তৈরী হল এবং মিম্বারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বয়ান করতে বসলেন, তখন আল্লাহর নবীর বিচ্ছেদ ব্যথায় উসওয়াতুল হান্নানা কিভাবে কাঁদলো এবং আল্লাহর নবী মিম্বর থেকে নেমে এসে কিভাবে সান্তনা দিলেন।

একটি কাণ্টখন্ড নবীর বিরহে কাঁদে! তোমার অন্তর যদি না কাঁদে মদীনার জন্য, নবীর যিয়ারাতের জন্য, তাহলে কী মূল্য এমন জীবনের!

পাথরের পাহাড় ভালোবাসে আল্লাহর নবীকে! তোমার হৃদয় যদি ভালোবাসতে না পারে, তোমার দিলে যদি মুহাব্বত না থাকে তাহলে কী মূল্য এমন মৃত হৃদয়ের! এমন মুরদা দিলের!

কী বললে! তুমি আশিকে রাসূল! তোমার দিলে আছে ইশকে নবী! তোমার হৃদয়ে বয়ে যায় নবীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার ঝর্ণধারা! তাহলে তোমার ঘরে, তোমার পরিবারে এবং তোমার জীবনে নেই কেন সুন্নাতের ছায়া?

নবীর সুন্নাত তোমার চোখের সামনে মিটে যায়, অথচ তুমি নির্লিপ্ত, তোমার দিলে লাগে না চোট!

নবুওয়তের উপর হামলা আসে, যামানার মুসায়লামারা (ভন্ড নবীর দাবীদার) উল্লাস করে, আর তুমি নির্বিকার, তোমার হাতে ঝলসে ওঠে না তলোয়ার! তারপরো তুমি আশিকে রাসূল হওয়ার দাবীদার! ইশক ও মুহাব্বাতের এ কেমন দাবী তোমার, আমার! প্রেম ও ভালোবাসার প্রমাণ কি শুধু মুখের স্লোগান!

শোনো বন্ধু! ইশক ও মুহাব্বাত এবং প্রেম ও ভালোবাসার দাবী হলো আনুগত্য। আমি যাকে ভালোবাসবো, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকেই

অনুসরণ করবো! তার প্রতিটি আচরণ এবং উচ্চারণ, আমি চাইবো আমার মাঝ যেন ঘটে এর পূর্ণ প্রতিফলন! আমার ওঠা বসা, চলা-ফেরা ও আহার নিদ্রা সবকিছু যেন হয় তার মত! যুগে যুগে প্রেমের জগতে এটাই হয়েছে এবং হতে থাকবে! নবীকে যারা ভালোবেসেছেন, আজীবন তারা নবীর সুন্নাতের উপর অবিচল ছিলেন! কখনো পরোয়া করেননি যুগ ও সমাজের নিন্দা-উপহাসের। বরং তাদের দ্বার্থহীন ঘোষণা ছিলো-

انترك سنة رسولنا لهذه الحمقاء

আমি কি আমার হাবীবের সুন্নাত ছেড়ে দেবো এই মূর্খদের জন্য? **(বাইতুল্লাহর মুসাফির)**

মদীনা শরীফে হাযিরী ও আদব

হাদিস শরীফে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে আমাকে সালাম দিবে আমি তার সালামের জবাব দেই (মুসনাদে আহমদ)

হজ্জের আগে ও পরে মদীনা শরীফের যিয়ারতে যাওয়া জায়েয আছে। তবে হজ্জের পরে যাওয়া ভাল। মদীনা শরীফে রওয়ানা দেয়ার পরই পূরা রাস্তায় যতবেশী সম্ভব দরূদ শরীফ ও ইসেতগফার পড়তে থাকুন। মদীনা শরীফে অবস্থান কালীন যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। অযথা গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা চাই এবং সর্বদা নযরের খুব হেফাজত করবেন। নীচের দিকে তাকিয়ে চলার চেষ্টা করবেন। নযরের খেয়ানত সবসময় এবং সবখানেই কবীরা গুনাহ। কিন্তু হজ্জের সময় পবিত্র ভূমিতে আরো বড় গুনাহ, আরো বড় বরবাদির কারণ।

যখন মদীনা শহর ও মসজিদে নববী দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মুহাব্বাতের সাথে বেশী পরিমাণ দরূদ শরীফ পড়তে থাকুন এবং গুনাহ থেকে তাওবা-এস্তেগফার করে পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী হবার মনে মনে অঙ্গীকার করুন।

"সাহাবায়ে কেরাম শিখেছিলেন নবীর ইচ্ছার সামনে 'আত্ম আকাঙ্ক্ষাকে হাসিমুখে কোরবান করতে। প্রতি বছর লাখ লাখ আশিকানে রাসূল এখানে আসেন, তারা যদি এই মহান শিক্ষাটুকু এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন, কত যে ভালো হয়! জীবনের অঙ্গনে প্রতিটি কর্মে আমার ইচ্ছায় নয়। আমি চলবো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছায়। তাহলে তো মুসলিম উম্মাহর জীবন চিত্রই পরিবর্তিত হয়ে যেতো! অন্যের কথা ভাবছি, আমি নিজেও কি তা পেরেছি!

হে আল্লাহ তাওফিক দাও আমাকে এবং সবাইকে, যারা এসেছে তাদেরকে; যারা আসবে তারেকে এবং যারা আসতে চাইবে তাদেরকে। **(বায়তুল্লাহর মুসাফির)**

মসজিদে নববীতে নামাযের ফযিলত

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদের নববীতে এক রাকাআত পড়লে হারাম শরীফ ব্যতিত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম। শুনানী ইবনে মাজাহ এর বর্ণনা মতে এক রাকআতে পঞ্চাশ হাজার রাকআতের সাওয়াবের কথাও উল্লেখ আছে।

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে মালপত্র রেখে সম্ভব হলে গোসল করে, না হয় ওযু করে নিন। এরপর সাদা বা ভাল কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে যিয়ারতের নিয়তে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিন। মদীনায় যাবার জন্য বা যিয়ারতের জন্য ইহরামের প্রয়োজন নেই।

সালাম পেশ করার আদব

সম্ভব হলে বাবে জিবরাঈল দিয়ে রওযা শরীফের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করা ভাল। যে কোন দরজা দিয়েও প্রবেশ করা যায়। দু'আ, দরুদ পড়া অবস্থায় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে ডান পা দিয়ে (এবং প্রতিবারেই মসজিদে প্রবেশের সময় এ বইয়ে উল্লেখিত পাঁচটি সুন্নাতের সাথে) প্রবেশ করুন। ভীড় না থাকলে রিয়াযুল জান্নাতে, না হয় যে কোন স্থানে (মাকরুহ সময় না হলে) প্রথমে দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়েননি। ফরয নামাযের সময় হলে আগে ফরয পড়ে নিন।

রওযা মুবারকের সামনে জালীর মাজে তিনটি ছিদ্র রয়েছে। প্রথম ছিদ্র (যার উপরে বড় গোলাকার সবুজ প্লেট রয়েছে) বরাবর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারক বরাবর কিবলার দিকে পিঠ করে বুকে ও পেটে হাত না বেঁধে অত্যন্ত আবেগ, আদব ও বিনয়ের সাথে সামান্য আওয়াযে সালাম পেশ করুন। সালাম এভাবে বলা উত্তম।

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

الصلوة والسلام عليك يا نبي الله

الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله

الصلوة والسلام عليك يا رحمة للعالمين

الصلوة والسلام عليك يا سيد المرسلين

الصلوة والسلام عليك يا خاتم النبيين

الصلوة والسلام عليك يا خير خلق الله

الصلوة والسلام عليك شفيع المذنبين

আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীইয়্যাল্লাহ।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল লিল আলামীন।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালীন।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবিয়্যিন।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খালক্বিল্লাহ।
আস্‌সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফীআল মুযনিবীন।
সময় পেলে বারবার পড়ুন। সম্ভব হলে দুরুদ শরীফও পড়ুন।

অন্য কেহ সালাম পৌঁছানোর কথা বলে থাকলে এভাবে বলবেন-

ইয়া রাসুলাল্লাহ! অমুক অমুকের পক্ষ তেকে সালাম কবুল করুন। যদি নাম নেয়ার সময় না থাকে তাহলে এভাবে বলুন, যারা আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন, সকলের পক্ষ তেকে আপনি কবুল করে নিন।

সম্ভব হলে এবং সময় থাকলে নিজ পিতা মাতা, ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের; সম্ভব হলে, মনে থাকলে নাম নিয়ে এই লেখকের সালাস পৌঁছাবেন। রওযা শরীফের জালী বা দেয়ালে হাত লাগানো, চুম্বন করা, মাথা ঝুকিয়ে সালাম পেশ করা, রওযা মুবারকের দিকে হাত তুলে দুয়া করা নিষেধ। **(আল-ফিকহুল ইসলামী)**

হযরত আবু বকর রা.

যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবরাক থেকে সামান্য অগ্রসর হয়ে দ্বিতীয় ছিদ্রের সামনে এসে হযরত আবু বকর রা. এর প্রতি এভাবে পেশ করবেন।

السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابابكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله في الغار، فجزاك الله عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم.

অথবা সংক্ষেপে **'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকরিনিস সিদ্দিক।**

হযরত উমর রা.

অতপর ডানদিকে এক হাত সরে তৃতীয় ছিদ্রের সামনে হযরত উমর রাযি. এর চেহারা মুবারক বরাবর সালাম পেশ করবেন-

السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق رضي الله عنه فجزاك الله عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم

সংক্ষেপে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া উমরাল ফারুক রা.।

সালাম পেশ করার পর কিবলামুখী হয়ে সম্ভব হলে রওযা আতহারের জালি বরাবর পিছনে এমন ভাবে দাঁড়াবেন যাতে রওযা মুবারক এর দিকে পিঠ না হয় এবং সম্ভব হলে আবার সালাম করুন। তারপর আপনার ইমানের সাক্ষ্য স্বরূপ কালেমায়ে শাহাদাত পড়ুন।

'আশহাদু আললা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। তারপর হুযুরের সামনে আল্লাহ তাআলার নিকট খালেস দিলে তাওবা ইস্তিগফার করুন। এরপর দরূদ শরীফ পড়ে প্রাণভরে দুআ' করুন।

দু'আর পূর্বে সম্ভব হলে পাঠ করুন-

أشهدُ أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن جميع الأمة خير ماجري نبنا عن أمته. اللّٰهُمَّ اعط لسيدنا عبدك ورسولك محمدٍ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة و ابعثه مقاما محمودا وأنزله المنزل المقرب عندك إنك

سبحانك ذو الفضل العظيم .

এরপর হুযুরের শাফাআত কামনায় সম্ভব হলে এই ভাবে বলুন-

السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

قد جئتك مستغفرا من ذنوبي، مشتشفعا بك الي ربي .

রওযায়ে আতহারের সামনে জালির উপর আরবী কয়েকটি কবিতা লেখা আছে সম্ভব হলে পড়ে নিবেন

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ + فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ
نَفْسِيْ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ + فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ
أَنْتَ الشَّفِيْعُ الَّذِيْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ + عَلَى الصِّرَاطِ اِذَا مَا زِلْتُ الْقَدَمُ
وَصَاحِبَاكَ فَلَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا + مِنِّيْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ

ফাতহুল কাদির : ২/১৭৯-১৮১; আলমগীরী :১/২৬৫-২৬৬ , মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ :৩১৮-৩২২

নবীগন নিজেদের কবরে জীবিত

সহীহ বর্ণনায় এসেছে , নবীগন নিজেদের কবরে জীবত অবস্থায় থাকেন ।

ان الله حرم على الأرض ان تاكل اجساد الانبياء، فنبي الله حي يرزق

অর্থ

আল্লাহ তায়ালা নবীগণের শরীর মাটির উপর হারাম করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী রওযায় জীবিত অবস্থায় আছেন এবং রিযিকপ্রাপ্ত ।

ইবনু মাজাহ : ১৬৩৭; সুনানু আবি দাউদ : ১০৪৭; সহীহ ইবনে খুজাইমা: ৩/১১৮ , হাদিস নং : ১৭৩৩; মুসতাদরাকে হাকেম : ১/২৭৮ , হাদিস নং : ১০২৯; মুসনাদে আহমদ : ১৬১৬২; নাসির উদ্দিন আলবানী , সিলসিলাতুস সহীহা : হাদিস নং : ৬২১ ।

আল-ইতিকাদ : পৃ-৪১৫ , দারুল ফযীলাহ রিয়াদ , আত-তারীখুল কাবীর : ২/২৫৪; ফাতহুল বারী : ৭/৩৩; মাআরিফুল কুরআন , মুফতী মুহাম্মদ শফী

রহ. : ২/৪৫ , দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায়ে ফিকরিয়্যাহ তাওজীহিয়্যা: পৃ- ৬২৪; মাজমাউয যাওয়াইদ :৮/২১১ , হাদীস : ১৩৮১২; নাইলুল আওতার : ৩/২৪৭।

চল্লিশ ওয়াক্ত নামায

মদীনা শরীফে পুরুষদের এক ওয়াক্ত নামাযও যেন জামাত ও তাকবীরে উলা ছাড়া পড়া না হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত:

> যে ব্যক্তি চল্লিশ ওয়াক্ত নামায একাধারে জামাআতে তাকবীরে উলার সাথে আদায় করবে সে জাহান্নামের আযাব ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির ছাড়পত্র পাবে। **মাজমাউল ফাতওয়া : ৬/৬৭৭ , হাদিস নং : ৫৮৭৮; আলমগীর : ২/১৯৩ , হাদিস নং : ১৭৯৯**

কোন রেওয়ায়েতে চল্লিশ ওয়াক্ত মসজিদে নববীর ব্যাপারেও পাওয়া যায়। এ কারণে মদীনা শরীফে চল্লিশ ওয়াক্তের হিসাব করা হয়। তবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে আদায় করা ফরয, ওয়াজিব বা জরুরী কিছু নয় এবং এটা হজ্জের ও কোন অংশ নয়।

মহিলাদের যিয়ারত

মহিলাদের জন্যও যিয়ারতে যাওয়া মুস্তাহাব। মহিলাদের জন্য যিয়ারতের নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত গেইট রয়েছে। সেখান দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে সালাম পেশ করুন। ভিড় থাকলে দূর থেকে সালাম পেশ করবেন। ধাক্কা ধাক্কি বা হট্টগোল না করে আদবের সাথে যতটুকু নিকটে যেতে পারেন সেখান থেকে রওযা মুবারকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করে মনভরে দুআ' করুন। উযর অবস্থায় থাকলে মসজিদে যাবেন না। দূর থেকে সালাম পেশ করবেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় মহিলাগন পর্দার প্রতি খুব খেয়াল রাখবেন। মহিলাদের পৃথক স্থানে মসজিদে বা বারান্দায় নামাযের জায়গা না পেলে ঘরে নামায আদায় করে নিন। বেপর্দা ও পুরুষদের সাথে নামায আদায় করলে গুনাহগার হবেন। উভয় হারাম শরীফে ইবাদাতের সাওয়াব যেমন অধিক, গুনাহর ভয়াবহতা ও তেমন বেশী।

রিয়াযুল জান্নাত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান।
> **বুখারী: ১/১৫৯; মুসলিম: ১/৪৬; তিরমিযী : ২/২২৯।**

মসজিদে নববীর যে কোন স্থান বরকতের হওয়া সত্ত্বেও এ বিশেষ অংশটুকু (যেখানে বর্তমানে সাদা ও হালকা সবুজ নকশা কার্পেট দেয়া আছে) অত্যন্ত বরকতময়।

'রাহমানের রাহীমানা শান ভেবে কুলকিনারা পাইনা। দুনিয়াতেই জান্নাতের বাগিচা কেন সাজালেন তিনি। বান্দার প্রতি এত দয়া! এত মায়া! বিশাল কোন আয়তন নয় এ বাগিচা! মাত্র কয়েক গজের ছোট একটি খন্ড! কিন্তু আল্লাহর এমন একজন বান্দা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি দরবারে মদীনায় এসেছেন, অথচ জান্নাতের বাগিচায় প্রবেশের এবং অন্তত দু'রাকাআত নামায আদায়ের সৌভাগ্য তার জুটেনি! লক্ষ লক্ষ আশিক বান্দা আসেন এবং ঐ জান্নাতের টুকরায় প্রবেশ করেন। আল্লাহর কুদরত, দয়া ও রহমত ছাড়া এ কিভাবে সম্ভব! রাহীম ও রাহমানের দয়া ও করুনার কাছে আমি আশা করি, জান্নাতের বাগিচায় একবার যে প্রবেশ করেছে সে কিছু না কিছু পেয়েছে। এমনকি যে যার যার জন্য দুআ করবে তারা ও কিছু না কিছু পাবে। **(বায়তুল্লাহর মুসাফির)**

(হে আল্লাহ! আমাদের ভবিষ্যত বংশধর কলিজার টুকরো সন্তানদের এবং আমার সন্তানদের ধারণ করে যে এত কষ্ট করেছে এবং ভাইবোন কেহ যেন বাদ না পড়ে তোমার হাবীবের সাজানো এই জান্নাতী দস্তরখান থেকে। আমীন! লেখক।)

তাই সেখানে গিয়ে মিম্বর ও আযানের স্থানে নফল নামায পড়ে খুব দু'আ করবেন। তবে রিয়াযুল জান্নাতে স্থান পেতে কুব কষ্ট হয়। এখানে অনেককে দৌড়াদৌড়ি ও ধাক্কাধাক্কি করতে দেখা যায়। এটা ঠিক নয়। নফল ও বরকত হাসিলের জন্য মসজিদের আদব পরিপন্থী কাজ মোটেও সমীচিন নয়। ইশার নামায এবং ইশরাকের পর ভাগ ভাগ করে সকলকে রিয়াদুল জান্নায় গিয়ে উস্তুয়ানায়ে আয়েশা, উস্তুয়ানায়ে আবু লুবাবা, উস্তুয়ানায়ে হান্নানাহ, আল্লাহর নবীর মিম্বর ও মেহরাবে সম্ভব হলে দু-চার রাকাআত নামায পড়ে খুব দু'আ করবেন।

জান্নাতুল বাক্বী

জান্নাতুল বাক্বী হলো মদীনার প্রাচীনতম কবরস্থান। যেখানে মা ফাতেমা রা. হযরত খাদীজা রা. ও হযরত মাইমুনা রা. ব্যতিত সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন সহ হুযুরের পরিবারবর্গ, হযরত আব্বাস রা. হযরত হাসান রা. নবীজির দুধমা বিবি হালিমা সা'দিয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একে একে দুই কন্যার জামাতা যিননূরাইন (দুই নূরের

অধিকারী) মাযলুম সাহাবী তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণি রা. সহ বহু সাহাবায়ে কিরাম, গুহাদাগণ ও আউলিয়ায়ে কিরাম-এর কবর আছে। তাই প্রতিদিন যিয়ারতে যাওয়া বিশেষ করে শুক্রবারে যিয়ারত মুস্তাহাব।

ভিতরে যেয়ে যিয়ারত করতে না পারলে বাহিরে দাঁড়িয়ে ও যিয়ারত করা যায়। জান্নাতুল বাকীতে যিয়ারতের সময় বা এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এই দু'আ পড়বেন-

اَلسَّـــــلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ يَرْحَمُكُمُ اللهُ، نَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةُ جَزَاكُمُ اللهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ وَاِنَّا ان شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْن.

উচ্চারণ

আস্সালামু আলাইকুম দারা ক্বাওমীম মু'মিনীন ইয়ারহামুকুমুল্লাহু নাসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ জাযাকুমুল্লাহু আন্না খাইরাল জাযা, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাকিন।

এর পর মদীনা শরীফে অবস্থানকালীন সূরা ফাতিহা ও ইখলাসসহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যা সম্ভব পড়বেন।

মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালীন প্রতিটি মূহুর্তকে গনীমত মনে করবেন। কোন প্রকার গুনাহ-বেপর্দা ইত্যাদি থেকে সতর্ক থাকবেন। এ মুবারক শহরে ও যদি গুনাহ হয় এর চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে? সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত, যিকর ও দীর্ঘ দু'আয় সময় কাটাতে চেষ্টা করবেন। জামাত ও তাকবীরে উলাসহ গুরুত্বের সাথে নামায আদায় করুন। মসজিদে নববীতে এক নামাযে এক হাজার নামাযের, কোন কোন বর্ণনা মতে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। যত বেশী সম্ভব বারবার রওযা মুবারকের সালাম পেশ করবেন। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর। যদি যিয়ারতের জন্য রওযা মুবারকের নিকটে যাওয়া না যায় তাহলে যতটুকু নিকটে যাওয়া সম্ভব হয় বা মসজিদে নববীর বাহির দিয়েও সালাম পেশ করা যায়। তবে সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করার ফযিলত অনেক বেশী।

মসজিদে কুবা : ইসলামের প্রথম মসজিদ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে তাশরীফ আনার পর শহরের প্রবেশের মুখে কুবা নামক স্থানে নামায পড়েছিলেন। পরে এখানে মসজিদ স্থাপিত হয়। ইহা ইসলামের প্রথম মসজিদ। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার পর ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। হাদীস এসেছে, ঘর থেকে ওযু করে এখানে এসে দুই রাকআত নফল নামায পড়লে এক উমরা সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় এসে নামায পড়তেন। তাই সেখানে গিয়ে দু'চার রাকাআত নফল নামায পড়বেন।

মসজিদে কেবলাতাইন ও অন্যান্য স্থান

এছাড়াও ঐতিহাসিক মসজিদে কিবলাতাইন, (যেখানে কিবলার হুকুম বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে প্রায় ১৭ মাস পর পরিবর্তনের আদেশ আসার পর নামাযের ভিতর ফিরে সাহাবাগণ কিবলামুখী হয়ে যান।), খন্দক যুদ্ধের স্থান, খন্দক প্রান্তরে ৭টি মসজিদ মসজিদে ফাতাহ, মসজিদে গামামাহসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান সমূহ যিয়ারতে যাবেন। বিশেষ করে উহুদ প্রান্তরে উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের কবরও অবশ্যই যিয়ারত করবেন।

উহুদ প্রান্তর

সেই প্রান্তর, যেখানে যুদ্ধের সাজে আল্লাহর নবী হাযির হয়ে ছিলেন সাতশ জানবায সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে, শিরক ও কুফরির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনকে কিয়ামাত পর্যন্ত যিন্দা রাখার জন্য। আজ আমরা হাযির হয়েছি আরামদায়ক গাড়ীতে করে, কেন? হযরত হাফেজী (রহ.) বললেন, উহুদের ময়দানে আমরা এসেছি শহীদানে উহুদের পিছনের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য। আমাদের মুরদা দিলে শাহাদাতের তামান্না আবার যিন্দা করার জন্য।

'এইমাটি একদিন শাহাদাত ও কোরবানীর ইতিহাস তৈরী হয়েছিলো, সাতশ জানাবায় সাহাবীর পাথার উপর তিন হাজার তলোয়ার ঝলসে উঠার ইতিহাস। সাহাবায়ে কেরাম এখানে ইতিহাস তৈরী করেছেন। দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এখানে আজ এসেছি দর্শক হয়ে অথচ একদিন এখানে হক বাতিলের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিলো। আল্লাহর নবীর দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এসেছিলো; এখানে এই মাটিতে আল্লাহর নবীর রক্ত ঝরেছিলো! দান্দান শহীদ হয়েছিলো। এখানে এই মাটিতে আমার পেয়ারা নবী পড়ে গিয়েছিলেন যখমী হয়ে।

উহুদের প্রান্তরে আমরা আজ দর্শক। অথচ সেদিন এখানে শহীদানের

সরদার, নবীর চাচা হযরত হামযা রা. এর বুকচিরে কলিজা বের করা হয়েছিলো এবং সে দৃশ্য আল্লাহর নবীকে দেখতে হয়েছিলো। কেমন কষ্ট হয়েছিলো সেদিন আমার পেয়ারা নবীর।

আকাশের সূর্য সেদিনও এখানে ছিলো। কি দেখেছিলো সে এখানে সেদিন? তালহা রা. এর বীরত্ব! হযরত আলী রা.-এর শৌর্য! আবু দাজানার রা. বিক্রম, ওয়াহশীর হিংস্রতা রা. হিন্দার পৈশাচিক উল্লাশ। নূরের ফেরেস্তারা আকাশ থেকেই তো নেমে এসেছিলেন তাঁকে গোসল দিতে যিনি বাসরশয্যা থেকে ছুটে এসেছিলেন জিহাদের ময়দানে। ভাই, স্বামী ও পুত্রের শাহাদাতের খবর শুনেও যে পূর্ণবতী সাহাবিয়্যার একটি ব্যাকুল প্রশ্ন ছিলো আমার নবী কেমন আছেন? নবী আলাইহিস সালাম জীবিত আছেন, এই সংবাদ শুনার পর শান্ত হলেন।

যে জাবালে উহুদ! আল্লাহর নবী তোমাকে ভাল বাসতেন; তুমি ভালবাসতে আল্লাহর নবীকে।

হঠাৎ ভেসে এলো কান্নার আওয়ায ভাবের জগতে তন্ময় ছিলাম। আমার হযরতের (হাফেজ্জি হুযুর রহ.) কণ্ঠে! তাঁর হৃদয় নিংড়ানো মুনাজাতে। মুনাজাত তো নয়, কান্নার ঢেউ এবং অশ্রুর ঢল। আমারও হৃদয় -তটে আছড়ে পড়লো কান্নার ঢেউ! পারস্যের কবির ভাষায়-তোমার কান্না দেখে কাঁদি আমি, কিন্তু জানিনা তুমি কেন কাঁদো/কিসের ব্যথা তোমার বুকে! এতদিন দেখেছি দীপ থেকে দীপ জ্বলে আজ দেখি, চোখ ভেজে ভেজা চোখ থেকে। **(বায়তুল্লাহর মুসাফির)**

দরূদ শরীফের
ফযীলত

মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ অবস্থানকালে দৈনিক যত বেশি সম্ভব দরুদ শরীফের আমল করবেন। দৈনিক ইচ্ছে করলে প্রতি ওয়াক্তে কমপক্ষে ১ হাজার বার করে ৫ ওয়াক্তে ৫ হাজার, এভাবে পুরো হজ্জের সফরে দেড় থেকে দুইলক্ষ দরূদ শরীফ পড়া কঠিন কিছু নয়।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগন নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য সালাত ও সালাম প্রেরণ কর'। **(সুরায়ে আহযাব: আয়াত নং -৫৬)**

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

'যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দমটি রহমত অবতীর্ণ করেন, দমটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন **(নাসাঈ)**।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে, যতক্ষণ দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। **(ইবনে মাজাহ)**

'যখন কোন ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করে, তখন ঐ ব্যক্তির নামসহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছানো হয়। **(কানযুল উম্মাল)**

দরূদ শরীফ এর একটি ফযীলত উহাও যে, দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ নসীব হয়। কারণ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই অভ্যাস ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ হাদিয়া পেশ করলে এর চেয়ে উত্তম হাদিয়া তিনি দিয়ে দিতেন।

আমাদের উপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে, এর কোন সীমা নেই, সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ তো এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদৌলতে আমরা ঈমানের মত দৌলত পেয়েছি।

এ জন্য প্রতি মূহুর্তে শুকরিয়া আদায় করে দরূদ পাঠ করা চাই। এ কারণেই দুঃখ-কষ্টের সময়, যে কোনো অসুস্থতায়, অযুর সময়, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, হিংস্র প্রাণীর সামনে পৌঁছালে, ঘুম যাওয়ার পূর্বে এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা শুরু করার পূর্বে, দু'আ শুরু এবং শেষে মোটকথা জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে দরূদ শরীফ পড়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম নেওয়া হয় অথচ সে দরূদ পাঠ করে না, সে (পৃথিবীর সবচেয়ে বড়) কৃপণ'।

দরূদ শরীফ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি করে। বেশি বেশি দরূদ পড়লে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার নসীব হয়।

নিম্নে কয়েকটি দুরূদ শরীফ উল্লেখ করা হচ্ছে

- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و على آلِ مُحَمَّدٍ، كما صـــــلَّيْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبـــراهيمَ إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللّٰهمَّ بارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، كما باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّك حميدٌ مجيدٌ
- صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّيَ عليه، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ.

- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ اَدَاءً.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَعَلَى آلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وسَلِّم.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ، وَأَجِرْهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِيْ اَوَّلِ كَلَامِنَا، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِيْ اَوْسَطِ كَلَامِنَا، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِيْ آخِرِ كَلَامِنَا.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍعَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَرَسُوْلُكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وعَلَى آلِهِ وأَزْوَاجِهِ وذُرِّيَاتِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ ورِضَا نَفْسِكَ وزِنَةَعَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ المُصْطَفَى، وَرَسُولِكَ المُرْتَضَى، وَوَلِيِّكَ المُجْتَبَى، وَأَمِينِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ.
- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ فِي الأَجْسَادِ، وَعَلَى رُوحِهِ فِي الأَرْوَاحِ، وَعَلَى مَوقِفِهِ فِي المَوَاقِفِ، وَعَلَى مَشْهَدِهِ فِي المَشَاهِدِ، وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ، صَلَاةً مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا.
- اللَّهُمَّ أَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ، كَمَا ذُكِرَ السَّلَامُ، وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ، وَرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.
- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمَاً كَثِيرَاً، طَيِّبَاً مُبَارَكَاً فِيهِ، جَزِيلَاً جَمِيلَاً، دَائِمَاً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ.

- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ القَلَمُ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَومٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.
- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، مِنْ يَومِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَومٍ أَلْفَ مَرَّةٍ.
- اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَابًّا زَكِيًّا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَهْلاً مَرْضِيًّا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًّا، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الصَّلَاةِ شَيءٌ.
- اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ، وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ، وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَتَحْتَ لِوَائِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ، وَأَوْرِدْنَا حَوضَهُ، وَاسْقِنَا بِكَأْسِهِ، وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ، اللَّهُمَّ آمِينَ.
- اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الأَهْوَالِ وَالآفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، بَعْدَ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

শেষ বিদায়

যখন সরদারে দু'আলম, আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত এবং মদীনা যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে, তখন মসজিদে নববীতে যেখানে সুযোগ হয় দুরাকাআত নামাজ পড়ে রাওযা মুবারকে উপস্থিত হয়ে শেস বারের মতো সালাম পেশ করবেন। তারপর হজ্জ ও যিয়ারত পুনরায় নসীব হওয়ার জন্য, নিজের প্রয়োজনের জন্য এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্য খুব দু'আ করবেন। যতটুকু সম্ভব বিদায়ের বেদনা প্রকাশ করে কান্নাকাটি করবেন। তারপর ক্রন্দন করতে করতে পুনরাই মদীনা মুনাওয়ারায় যিয়ারতের চরম আশা মনে ধারন করে এবং বিচ্ছেদের কারণে অত্যন্ত ব্যথিত অন্তরে ধীর পদক্ষেপে রওয়ানা হবেন।

মক্কা শরীফ বা মদীনা মুনাওয়ারাহ যেখান থেকেই বিদায় নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয় তখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করে আল্লাহর দরবারে ক্রন্দনরত দু'আ করবেন:

> 'হে আল্লাহ আমি বায়তুল্লাহ শরীফ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর এবং এত বড় আমল হজ্জের হক আদায় করতে পারিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার ত্রুটি সমূহকে নেক আমলে পরিবর্তন করে দিন। আমাকে অতি নিকট সময়ে পুনরায় এখানে আসার তাওফিক দিন।'

তারপর সফরের দু'আ পড়ে বাসে উঠে পড়ুন। নিজ এলাকায় পৌঁছে এই দু আটি পড়বেন।

آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدونَ لِرَبِّنَا، حَامِدُونَ

উচ্চারণ

আইবু-না তাইবু-না আ-বিদু-না সা-জিদু-ন লিরব্বিনা হামিদু-ন।

হজ্জ থেকে ফিরে
কিভাবে চলা-ফেরা করা চাই

০১. হজ্জ থেকে ফিরে সর্বদা একথা মনের মধ্যে গভীরভাবে জাগ্রত রাখবেন যে, রহমানুর রাহীম কত বড় দয়ালু! যখন তিনি তাঁর ঘরের সম্মানিত মেহমানদের নাম লিখলেন, আমার মত এত বড় গুনাহগারের নামও অন্তর্ভুক্ত করতে তিনি ভুললেন না। অথচ আমি আমার রব্বে কারীমকে জীবনের পদে পদে ভুলেই রইলাম। তিনি আমাকে গুনাহর গান্দেগীর নীচুতা থেকে টেনে আসমানতূল্য মর্যাদার উঁচুতায় নিয়ে আসলেন। আমি যেন সেই উচুতা থেকে নিচে নেমে না আসি। মনে রাখবেন উপরে উঠা খুব কঠিন, কিন্তু নিচে নেমে আসা অতি সহজ। প্রতিমুহূর্তে একথা স্মরণে থাকা চাই আমার চক্ষু বায়তুল্লাহ্ শরীফকে দেখে এসেছে, আমার হাত বায়তুল্লাহকে স্পর্শ করেছে, আমার পা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে, আমার মুখ বায়তুল্লাহকে চুমু দিয়েছে। যমযম পান করেছে। অতএব, আমার এ চোখ, এ হাত, এ পা, এ মুখ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চোখ, শ্রেষ্ঠ হাত, শ্রেষ্ঠ পা, শ্রেষ্ঠ মুখ। আমি কিভাবে এই শ্রেষ্ঠ বস্তুকে নিকৃষ্ট স্থান গুনাহর কাছে ব্যবহার করবো। যিনি আমাকে এত মর্যাদা দিলেন আমি কিভাবে তাঁর হুকুম ছেড়ে দিয়ে তাঁর রাসূলের তরীকার বিপরীত চলে তাঁকে ভুলে যেতে পারি।

০২. হজ্জ করার কথা যথাসম্ভব অন্যদের কাছে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন। নিজের নামের সাথে আলহাজ্ব-হাজী লিখা ও বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন। বরং কেউ লিখলে বা বললে কঠিনভাবে নিষেধ করুন। আপনার এই হজ্জটি যেন হজ্জে মাবরুর বা কবুল হজ্জ হয়, অন্তরকে সর্বদা যাচাই করতে থাকুন। যে কোন আলোচনায় হজ্জের কথা এনে নিজের হজ্জের কথা প্রকাশ না করাই ভাল।

হযরত উমর রা. একজন বিধবা, অন্ধ বয়স্কা অসহায় মহিলার ঘর পরিস্কার

করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সকাল বেলা যখন তার ঘরে গেলেন, দেখলেন ঘর আগে থেকে পরিস্কার করা আছে। এমন সাওয়াবের কাজ ফজরের পূর্বে কে করলেন! মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল-রাতের অন্ধকারে কে যেন পরিস্কার করে গেছেন, আমি অন্ধ, আমি তো বলতে পারব না। হযরত উমর রা. দ্বিতীয় দিন ফজরের পূর্বে গিয়ে দেখলেন, এদিনও ঘর পরিস্কার করা হয়ে গেছে। তিনি আশ্চার্য হয়ে পরের দিন অর্ধ রাতে এমন এখলাস পূর্ণ কাজ কে করতেছিলেন তা দেখার জন্য চলে গেলেন। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে ঘরে প্রবেশ করে সবকিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে বের হয়ে যাচ্ছেন। হযরত উমর বললেন, আপনি কে? পরিচয় দিন। কিন্তু তিনি হযরত উমরকে এড়িয়ে চলে যেতে লাগলেন। কিন্তু হযরত উমরও নাছোড় বান্দা! বার বার বাধ্য করার পর চাদরের ভিতর থেকে তিনি বলে উঠলেন-কেন আপনি আমাকে পরিচয় দিতে বাধ্য করছেন? আওয়ায শুনে হযরত উমরের রা. শরীর কেঁপে উঠল। এই ব্যক্তিটি অন্য কেউ নন! তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.।

আল্লাহ ত'আলা আমাদেরকেও প্রতিটি আমল এভাবে এখলাসের সাথে করার তৌফিক নসীব করুন।

০৩. হজ্জ পালন করার পর সর্বদা নিজের জীবনকে সুন্নাত মুতাবেক পরিচালিত করতে ও যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট থাকবেন।

০৪. অবশ্যই হালাল পন্থায় জীবন পরিচালনা করবেন এবং সুদ-ঘুষ তথা হারাম উপার্জন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকবেন।

০৫. বেপর্দা চলা-ফেরা, টিভি, ডিস, মোবাইল ইত্যাদি যাবতীয় গুনাহ থেকে নিজে এবং পরিবারকে সম্পুর্ণ মুক্ত রাখা একান্ত জরুরী।

০৬. মিথ্যা কথা বলা, ধোঁকা দেয়া ও মিথ্যার আশ্রয় থেকে বিরত থাকুন।

০৭. হায়াতকে আখেরাতমুখী করার চেষ্টা করবেন।

০৮. হজ্জের সফরের কষ্ট, মক্কা শরীফ ও মদীনা মুনাওয়ারাহ ও এর অধিবাসীদের গুনের আলোচনা করবেন। তাদের সমালোচনা ও হজ্জের ব্যবস্থাপনার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকার চেষ্টা করবেন।

হজ্জ
কবুল হওয়ার আলামত

০১. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج পবিত্র হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর যাবতীয় গুনাহ এবং অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকবে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ সকলের সাথে ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করবে।

০২. সর্বাবস্থায় সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণে সচেষ্ট থাকবে।

০৩. কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, পারস্পরিক ব্যবহার ও আখলাকে আল্লাহর রাসুলের (খুলুকে আযীম) অনুসরণ করবে।

০৪. কিতাবে উল্লেখ আছে, হাজী সাহেবের হজ্জে মাবরুর ও মাকবুল হওয়ার আলামত হল দুনিয়ার প্রতি তার আগ্রহ কমে আসবে এবং আখেরাতমুখী হবে।

০৫. হজ্জ থেকে ফিরে ফরয ওয়াজিব আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, তাকওয়া ও পরহেযগারীতে আগের তুলনায় অনেক অগ্রগামী হবে। নফল ইবাদতের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক বেশী হবে।

০৬. হারাম উপার্জন ও যাবতীয় গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে। এবং তার মধ্যে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(ফাতহুল কাবীর :৩/৩৮২; উমদাতুল কারী, সূত্রে মাআরিফুস সুনান : ৬/৩৩২)

দুআ'য়ে মাসূরা

হজ্জের এই সফরে দৈনন্দিনের দুআয়ে মাচুরাগুলো শিখে আমলের অভ্যাস করা চাই , যাতে বাকী জীবন আমলের অভ্যাস হয়ে যায় ।

নিম্নে কিছু দুআয়ে মাসূরা উল্লেখ করা হচ্ছে

ঘুম যাওয়ার সময় নিম্নের দু'আটি পড়তে হয়:

সুন্নত অনুযায়ী অযুর সহিত শুইবে , তারপর এই দু'আ পড়িবে ।

اَللهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَى

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমুত , ওয়া আহইয়া ।

ঘুম হইতে জাগ্রত হইলে এটি দু'আটি পড়তে হয় ।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিননুশুর ।

সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহিল্লাযী লাইয়াদুররু মা'আসছমিহী শাইয়ূং ফিল আরদি ওয়ালা ফিসসামাই ওয়াহুয়াসসামীউল আলীম।

ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اَللهُمَّ أجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার।

বাথরুমে প্রবেমের সময় এ দু'আ পড়তে হয়

اَللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ

বাথরুম হতে বাহির হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذَى وَعَافَانِيْ

উচ্চারণ

আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযহাবা অন্নীল আযা ওয়াআফানী

অযুর শুরুতে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদুল্লিাহ।

অযু শেষ করে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়ারাসূলূহ আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্তাওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুত্তাহবিরীন।

নিজের ঘরে প্রবেশ করার সময় নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اَللهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَ بِسْمِ اللهِ لَجْنَا وخَرَجْنا وَعَلى ربِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাল মাওীরজি ওয়া খায়রাল মুখরাজি বিসমিল্লাহি ওয়ালাজানা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।

ঘর হতে বাহির হওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালুত আলাল্লাহি লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

খানা খাওয়ার শুরুতে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ وَ عَلى بَرَكَةِ اللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াআলা বারাকাতিল্লাহি

খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْن

উচ্চারণ

আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়াসাক্বানা ওয়ালানা মিনাল মুসলিহীন।

দাওয়াত বা অন্যের ঘরে খাওয়ার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَ اَسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আতইম্মান আতআমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বানী।

দুধ পান করার পর নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীহ ওয়াযিদনা মিনহু।

কাপড় পরিধানকালে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ، وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ

আলহামুদলিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা ওয়ারাযাক্বানীহ মিন গাইরে হাওলিমমিন্নী ওয়ালা কুওয়াতা।

সফর হতে বাড়ী ফিরলে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

উচ্চারণ: আইবূনা তাইবূনা আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূন।

কাউকেও বিদায় দেয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

سْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

উচ্চারণ

আসতাওদিউল্লাহা দীনাকা ওয়াআমানাতাকা ওযা খাওয়াতীমা আমালিকা

নতুন চাঁদ দেখলে নিনেরূর দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলইয়ূমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলামি ওয়াতাওফীক লিমা তুব্বিু ওয়াতারদা রব্বি ওয়ারাব্বুকা আল্লাহ।

গল্প-গুজবের পর কোন বৈঠক হইতে উঠার আগে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبَحَمْدِكَ أَشْهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ

সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াআতুবু ইলাহি।

ঋণগ্রস্ত হলে নিম্বের দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিক ওয়াআগনিনী বিফাদলিকা আম্মান সিওয়াক।

আয়নায় মুখ দেখলে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়

اَللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা হাসসানতা খলকী ফাহাসসিন খুলুকী।

হাঁছি দিলে আহে দু'আ পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِله

উচ্চারণ: আলহামদুলিল্লাহ।

হাঁছির উত্তরে এই দু'আ পড়তে হয়

يَرْحَمُكَ اللهِ

উচ্চারণ: ইয়ারহামুকাল্লাহ

يَهْدِكُمُ اللهُ يُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণ: ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়াইইসলিহ বালাকুম।

মদীনায় শাহাদা ও মৃত্যুর ইচ্ছা করলে এই দু'আ পড়তে হয়

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ

উচ্চারণ

আল্লাহুম্মারজুকনী শাহাদাতান ফি সাবিলিকা ওয়াজআল মাওতী বিবালাদি রাসূলিকা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে, আমাদের ভিবিষ্যৎ বংশধর কলিজার টুকরো সন্তানদের এবং আমাদের ভাই-বোন, বন্ধু বান্ধব যারা যিয়ারততে হারামাইন শরীফাইনের জন্য দুআ চেয়েছেন ও যিয়ারতের স্বপ্ন দেখেন, তাদের সকলকে বায়তুল্লাহ শরীফ ও রওযা মুবারকের যিয়ারত বার বার নসীব করুন এবং সকলকে হজ্জে মাবরুর নসীব করুন, আমীন।